KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ [illegible] লেন, [illegible], কল-৬৯
Collection KLMLGK	Publisher সুব্রত সর্বাধিকারী
Title অন্তরীপ (Antareep)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number ? (Annual No) ? (Annual No) ? (Annual No) ? (Annual No)	Year of Publication : NOV 1992 OCT 1993 Jun 1994 Jun 1997
	Condition : Brittle Good ✓
Editor সুব্রত সর্বাধিকারী	Remarks

C.D. Roll No KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

জুন ১৯৯৭

অন্তরীপ

কবিতা সংকলন সংখ্যা

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

অন্তর্দ্বীপ

জুন ১৯৯৭

অরুণ মিত্র ১ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩ রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী ৪ মণীন্দ্র গুপ্ত ৫ শঙ্খ ঘোষ ৬ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৭ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮ উৎপলকুমার বসু ৯ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৯ আলোক সরকার ১০ বিনয় মজুমদার ১১ অমিতাভ দাশগুপ্ত ১২ তারাপদ রায় ১৩ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪ মানস রায়চৌধুরী ১৫ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৬ নবনীতা দেবসেন ১৭ সুনীলকুমার নন্দী ১৯ পূর্ণেন্দু পত্রী ২০ কবিতা সিংহ ২১ শিবশম্ভু পাল ২২ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ রঞ্জিত সিংহ ২৪ দিব্যেন্দু পালিত ২৬ ভাস্কর চক্রবর্তী ২৭ দেবারতি মিত্র ২৮ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ২৯ কালীকৃষ্ণ গুহ ৩০ গীতা চট্টোপাধ্যায় ৩১ মণিভূষণ ভট্টাচার্য ৩২ অরুণেশ ঘোষ ৩৩ পবিত্র মুখোপাধ্যায় ৩৪ রমেন আচার্য ৩৫ রত্নেশ্বর হাজরা ৩৬ বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৩৭ দেবদাস আচার্য ৩৮ প্রভাত চৌধুরী ৩৯ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০ কবিরুল ইসলাম ৪১ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৪২ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৪৩ তারাপদ আচার্য ৪৪ অমিতাভ গুপ্ত ৪৫ পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল ৪৭ রণজিৎ দাশ ৪৮ শ্যামলকান্তি দাশ ৪৯ জয় গোস্বামী ৫০ মৃদুল দাশগুপ্ত ৫১ সুবোধ সরকার ৫২ তুষার চৌধুরী ৫৩ সৈয়দ কওসর জামাল ৫৪ বীতশোক ভট্টাচার্য ৫৫ অজয় নাগ ৫৬ অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র ৫৭ একরাম আলি ৫৮ রমা ঘোষ ৫৯ অনুরাধা মহাপাত্র ৬০ সুব্রত সরকার ৬২ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩ অরণি বসু ৬৪ গৌতম চৌধুরী ৬৪ ব্রত চক্রবর্তী ৬৫ কৃষ্ণা বসু ৬৬ প্রশান্ত রায় ৬৬ উজ্জ্বল সিংহ ৬৭ সুজিত সরকার ৬৮ প্রমোদ বসু ৬৯ সুব্রত রুদ্র ৭০ নির্মল হালদার ৭১ সোমক দাশ ৭২ সুধীর দত্ত ৭৩ বাপী সমাদ্দার ৭৪ বিশ্বনাথ গরাই ৭৫ গৌতম ঘোষদস্তিদার ৭৬ পার্থপ্রিয় বসু ৭৭ সঞ্জীব প্রামাণিক ৭৮ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৭৯ দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ৮০ মল্লিকা সেনগুপ্ত ৮১ সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২ সংযম পাল ৮৩ রাহুল পুরকায়স্থ ৮৪ জয়দেব বসু ৮৫ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৬ জহর সেনমজুমদার ৮৭ চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ৮৯ নাসের হোসেন ৮৯ রূপা দাশগুপ্ত ৯০ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৯২ সুতপা সেনগুপ্ত ৯৩ শবরী ঘোষ ৯৫ অরূপ আচার্য ৯৬ প্রশান্ত মল্ল ৯৭ নিতাই জানা ৯৮ অঞ্জলি দাশ ১০০ প্রবুদ্ধ বাগচী ১০১ পিনাকী ঠাকুর ১০২ বিজন রায় ১০৩ শিবাশিস মুখোপাধ্যায় ১০৪ সার্থক রায়চৌধুরী ১০৫ সাম্যব্রত জোয়ারদার ১০৬ সমীর মজুমদার ১০৭ অভীক ভট্টাচার্য ১০৮ রাণা রায়চৌধুরী ১০৯ পৌলোমী সেনগুপ্ত ১১০ জয়ন্ত ভৌমিক ১১২ রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১৩ শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায় ১১৫ সব্যসাচী সরকার ১১৬ রোশেনারা মিশ্র ১১৭ অর্ণব সাহা ১১৯ সব্যসাচী ভৌমিক ১২০ সুমন গুণ ১২১ দেবজ্যোতি রায় ১২২ যশোধরা রায়চৌধুরী ১২৩ প্রসূন ভৌমিক ১২৪ অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫ রণজিৎ দাশগুপ্ত ১২৬ আবীর সিংহ ১২৭ সুব্রত সিনহা ১২৭ বিপ্রতীপ দে ১২৮ অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় ১২৯

প্রসঙ্গত

পর্যাপ্ত বিরতিযাপনের কুণ্ঠা কাটিয়ে প্রকাশ পেল 'অন্তরীপ'। এবারের নিবেদন দশকবাহিত এক কবিতা সংকলন। এ-জাতীয় কোনও সংকলনের প্রতিজ্ঞাপ্রসূত দায়বদ্ধতা মেনে নেওয়া মানেই ঝুঁকির প্রশ্ন, অপ্রিয়তা অর্জনের সম্ভাবনা। 'অন্তরীপ' এই অপ্রিয়তার প্রসঙ্গ স্বীকার করেও সম্ভাবনাকে অভ্যর্থনা জানাবার মত যে প্রত্যয় সঞ্চয় করতে পেরেছে, সেটি একই সঙ্গে আস্থারও নিদর্শন কিনা, পাঠকই তা বিচার করবেন। আর ঝুঁকি তো অবশ্যই। সংগ্রহশালায় যাঁর নামই অমুদ্রিত থাকে, অভিমানী হয়ে ওঠে তাঁর সমগ্র কবিসত্তা। অথচ নির্বাচিত সংকলনের আবহমান চেহারাটা কিন্তু এমনই হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে সকলেরই নিশ্চিন্ত আশ্রয় যেমন সম্ভব নয়, নয় কাম্যও। তাই যেখানে একটি সংকলন তার আপাত অপূর্ণতা নিয়ে ছেদ টানে, অনিবার্যভাবে বোধ হয় ঠিক সেখান থেকেই শুরু হয় যোগ্যতর সম্পাদনার নিরিখে পরবর্তী আরেকটি সংকলনের অমোঘ সংকল্প। ইতিহাসে এভাবেই অক্ষুণ্ণ থাকে সংকলিত ধারাবাহিক কবিতা চালচিত্রের পরিকল্পনা। এমনই হয়ে এসেছে সময় থেকে সময়ান্তরে, বলা যায় এটিই তার প্রচ্ছন্ন ঐতিহ্য। এ-ব্যাপারে 'অন্তরীপ'ও কোনও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তকে আদর্শ বলে মান্য করেনি।

এই সংকলনের সৌজন্যে বাংলা কবিতার সম্মানার্হ পাঠককে তিরিশ থেকে মধ্যনব্বই-এর কবিতার একটা অখণ্ডিত চারিত্র্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবার বিরল সুযোগ উপহার দেওয়া হল। দেওয়া হল সেই সঙ্গে কালানুক্রমিক বাংলা কবিতার যে প্রাকরণিক বিবর্তনের বহতা ধারা, তারও একটা স্বাদ নেওয়ার সময়োচিত আনুকূল্য। এতদিন যে আমরা জেনে এসেছিলাম কবিতার ইতিহাস মূলত আঙ্গিকেরই ইতিহাস, তা কখনই অসত্য ছিল না, কিন্তু প্রায়োগিক কারুকৃতি বাদ দিয়েও যে একটি কবিতা কতখানি ঋদ্ধ হতে জানে শুধু তার বিষয়গরিমায় ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র পুঁজির দৌলতে, যত দিন যাচ্ছে তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ, যাঁর কবিতা দিয়ে সূচনা এই সংকলনের যা তিনি সাম্প্রত সময়েই তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে, তাঁর কবিতার ওপর চোখ রেখে এবার একটু পরিক্রমা সেরে নিন একেবারে এই মুহূর্তে নব্বই-য়ে দাঁড়িয়ে যাঁরা লিখছেন সেই তাঁদের লেখার দিকে। সম্ভবত বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না যে সময়ের দ্রুতির সঙ্গে তাল রেখে, ধাবিত জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে কবিতা কতভাবে আর কতখানি অবিরাম বদলে নিচ্ছে তার নিজস্ব পোশাক, প্রসাধন এবং পরিব্যাপ্তি ; বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না, শুধু উপস্থাপনার তারতম্যে,—তা গদ্যেই হোক কিংবা ছন্দে—কতটা অন্যতর

মাত্রার অর্জনে আজ সপ্রতিভ আর সংকেতবহ হয়ে উঠতে চাইছে তরতাজাদের কবিতা। কবিতা যে বিষয় আর আঙ্গিকগতভাবে বদলে যায় সময়কে টান মেরেই যায়, সময়ের নিজস্ব ভাষাকে আত্মসাৎ করেই সে গড়ে তোলে তার যাবতীয় নির্মাণের প্রথা। আবার কোনও প্রথা নির্দিষ্ট হতে-না-হতেই চলে পরবর্তী পর্যায়ের ভাঙচুর অথবা কাঙ্ক্ষিত নিরীক্ষা। তিরিশ, চল্লিশ অথবা পঞ্চাশে যাঁরা তৎকালীন মেজাজে লগ্ন থেকে শুরু করেছিলেন তাঁদের উচ্চারণ, সেই তাঁরাই যখন অব্যাহত সামর্থ্যে লিখে চলেছেন আজও, ভঙ্গি কি পাল্টে যায়নি তাঁদেরও? গেছে নিশ্চয়ই। আর সেই পাল্টে যাওয়ার সামনে পাঠককে সরাসরি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার উপলক্ষও তো তৈরি হয়ে গেল এই সংকলনের সূত্রে।

সময়-অতিক্রান্ত ভিন্নমেজাজী নানারকম জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবেই তুলে নেওয়া যাক এই কবিতাগুলিকে। এক / দেড় বছরে প্রকাশিত বিভিন্ন গোত্রের পত্রিকা থেকে এদের আহরণ। এই সময়সীমার মধ্যে প্রয়াত কোনও কবির তেমন উজ্জ্বল উচ্চারণ প্রাপণীয় না হওয়ায় হয়ত তিনি অন্তর্ভুক্ত হননি এখানে, এমনও হতে পারে; ঘটে যেতে পারে এমনও কোনও কোনও কবির অনুপস্থিতি, যাঁদের তেমন প্রতিনিধিত্বসূচক কবিতা 'অন্তরীপ'-এর বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য বলে ধরা গেল না। এটি গ্রন্থমর্যাদাপ্রাপ্ত কোনও সংকলন নয়, পত্রিকার তরফে প্রকাশিত একটি অনাকাঙ্ক্ষী কিন্তু সুনির্বাচিত সংগ্রহ। মনে রাখতে হবে, অন্য ছোট পত্রিকার মত 'অন্তরীপ'কেও বাধ্যতামূলকভাবে আক্রান্ত হতে হয় স্থান-অপ্রতুলতার প্রশ্নে; নিরুপায় হয়ে সদিচ্ছা থাকা সত্বেও তাকে টানতে হয় নিষ্পত্তির একটা সীমারেখা। কিন্তু একই সঙ্গে সে এই বিশ্বাসেও স্থিত থাকতে চায় যে এখানে যাঁদের অন্তর্ভুক্তি ঘটল না, সম্পন্নতর অন্য কোনও পত্রিকার স্থানানুকূল্যে হয়ত তাঁরা কালক্রমে বিবেচিত হবেন, হবেন যোগ্যতার নিরিখেও। আসলে কোনও সংকলনই কি সেই অর্থে চূড়ান্ত, অবধার্য, অসমালোচনীয়? বরং তা নিরীক্ষ্যমান, অমীমাংসিত। এটুকু উদারমনস্কতা পাঠকের তরফ থেকে প্রত্যাশিত মনে করে এই পত্রিকাসংখ্যা; মনে করে এও, এই নিরপেক্ষ নির্বাচনে আস্থা রেখে যদি কেউ পাঠ করেন এই সংগৃহীত কবিতামালা, তিনি বঞ্চিত হবেন না এই মুহূর্তের লেখালিখির স্বাতন্ত্র্য ও মেজাজ থেকে।

সম্পাদিত ক্রিয়াকর্মের প্রতিক্রিয়া সবসময়েই অভিনন্দনীয়। এমন নয় যে এই সংকলন প্রত্যেক পাঠকগোষ্ঠীকেই খুশি করবে, হঠাৎ করে সার্বিক তৃপ্তির উৎসকারণ হয়ে উঠবে এই নির্বাচন কিংবা প্রত্যেকটি কবিতাই আলাদা করে উত্তীর্ণ হবার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে সমস্ত কবিতাপ্রেমীদের কাছে। এমন আকাশচুম্বী অবাস্তব উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকাটা কোনও সংকলনের পক্ষেই বাঞ্ছিত কি শোভন নয়। কিন্তু একেকটা দশককে অনন্যতায় শনাক্ত করার মত একদল কবি যদি জোটবন্ধভাবেও প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তাঁদের রচনায়, এবং সেই সত্যের ওপর আলোকসম্পাতে যদি 'অন্তরীপ' সামান্যতম ভূমিকাও এখানে পালন করে থাকে সততার সঙ্গে, সেটুকুই প্রাপ্তিযোগ ধরে নেওয়া ভাল, তার বেশি কিছু নয়। পাঠকপ্রিয়তা ও পাঠকবিরূপতা,—এ-দুয়েরই প্রয়োজন আছে প্রবল। আত্মতুষ্টির বদলে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াকে সমাদর জানানোর মত মুক্তমন চিন্তা-চেতনায় আমরা বিশ্বাস রেখেছি অগাধ। বলা যায় না, এই সংকলন-সম্পর্কিত সাময়িক ক্ষোভ থেকে হয়ত ভবিষ্যতে সম্ভাবিত হয়ে উঠবে অন্যরকম লেখালিখির প্রতীক্ষা, পাঠকরুচি তৈরি হয়ে উঠবে ভিন্নতর আদলে কিংবা আগামী কোনও সংকলনের নির্মম ও বায়কুণ্ঠ মনোনয়নে আরও অনেক রাশ টানা হবে কবিদের সংখ্যাতত্ত্ব; কিন্তু সেখানেও হয়ত সক্রিয় থাকবে আরেকজন সম্পাদকেরই নিজস্ব মানদণ্ড, তাঁর বিশেষ কোনও মায়ামুকুর। কবিতা নিয়ে এই বাছবিচার, পছন্দ-অপছন্দের তারতম্য ও হেরফের চিরকালই ছিল, আজও আছে, থাকবেও।

সংকলনটির প্রকাশ সহায়তায় আমাদের উদ্যোগের সঙ্গে সহমর্মী ছিলেন অনেকেই। আলাদা করে নামোল্লেখ না করেও তাঁদের জানাই আমাদের হার্দ্য কৃতজ্ঞতা। 'অন্তরীপ'-এর তরফে এই সংকলন-পরিকল্পনা নতুনরকমের এক পদক্ষেপ বলে আমার শিল্পীবন্ধু কৃষ্ণেন্দু চাকী উপযাচক হয়ে এর প্রচ্ছদও বদলে দিলেন নতুন ভাবনায়। তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। এই সংকলন থেকে এই মুহূর্তের কবিতার যদি সামান্য এক বাতাবরণও জেগে ওঠে তার পাঠকের কাছে, সেটাই হবে আমাদের প্রয়াসের বিনীত সাফল্য।

অকুণ্ঠ অভিনন্দনসহ,

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

৭. ৬. ৯৭.

খিদে

অরুণ মিত্র

আমার খিদে পেয়েছে খুব, কিন্তু কিছুই জোটেনি, মানে জোটাতে পারিনি অথচ সব সময় ভাবছি খাওয়ার কত মজা। সন্ধের গোনে দেখা হল একজনের সঙ্গে, তাকে খিদের কথা বলতে সে দেখিয়ে দিল ছায়াপথ। কেন, ওইখানকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্রগুলোকে গেলবার জন্যে? ওরা তো সূর্যের চাইতেও দশাসই। আরে তা যদি পারতাম, তাহলে তো সূর্যটাকেই কবে গিলে খেতাম। তা পারিনি বলেই সে দিনের পর দিন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে আর উস্কে দিচ্ছে আমার পেটের আগুন।

কিন্তু কে দেখাল আমাকে ছায়াপথ? নিশ্চয় সে পাগল, নয় কবি। ওই একই হল। না, ঠিক এক নয়। কবি আরো খাঁটি পাগল। বয়েসকালে যে পাগল হয়ে গেল এপারে বা পরপারে একটা মেয়ের কাছে যাওয়ার আকুলিবিকুলি নিয়ে, সেরকম হলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু তা নয়। এ একেবারে জন্মেই পাগল। খানদানী পাগল। এ কারণে, মানে পাগলসমাজের মধ্যমণি হিসেবে কবিদের একটু বেশি খাতির পাওয়া উচিত নয় কি?

যা হয় হোক। কবি বড় না পাগল বড় সে-তর্ক চুলোয় যাক। আসল কথা, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আরেকজনকে তা বলতে সে কিন্তু ছায়াপথ দেখাল না, বেশ সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়ে দিল একটা খাওয়ার ঘর। সেখানেই আমি এখন পৌঁছে গিয়েছি। সামনে টেবিল চেয়ার, টেবিলের ওপর পরিপাটি সাজানো কত সরঞ্জাম। আমি বসে পড়েছি চেয়ারে। আমার খিদে আরও বাড়ছে। কিন্তু রান্নাবাড়ার কোনো নামগন্ধ নেই। তাহলে? আমার খিদে তো আর বসে থাকবে না। সে খাবেই। আমি কেন সামলাব তাকে?

সে তো আমারই খিদে। খাক সে এই টেবিল চেয়ার থালা বাটি গেলাস, খেতে খেতে খেয়ে ফেলুক গোটা ঘরটা। ঘরবার নিশ্চিন্ত হয়ে যাক, আমার খিদে মিটুক। ছায়াপথ নয় হে, এই ধুলোপথেই এসো গিলে ফেলি সব। কবি পাগল খিদে পাওয়া আমজনতা সবাই এসো। আমাদের খিদেকে ভার দাও সব কিছু গিলে টিলে আর একটা জায়গা ভালো করে বানাক যেখানে এমন রাক্ষুসে চেহারা নিয়ে তাকে আর হামলে পড়তে হবে না।

পরম্পরা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রামকে পেছনে ফেলে
এক ছুটে
লক্ষ্মণ চলে গেল আগে।
একবার দিল্লীর এক সভায়
দেবেন্দ্র সত্যার্থী বলেছিলেন
আমি আর অমৃত রায়
যেন রাম-লক্ষ্মণ দুভাই।

কাল আমার সারাটা দিন যা গেছে।
ওর গল্প ও শেষ না করায়
আধকপালে হয়ে আমি থেকে গেলাম।
আমি যতই এপাশ-ওপাশ করি
আমাকে সমানে বিঁধবে
স্মৃতির চোরকাঁটা।

সকালে চোখ খুলতেই দেখি
সটান স্টেশন থেকে বাড়ি এসেছে
নতুন এক জীবন নিয়ে
বাপমা-মরা অলপ্পেয়ে অলবড্ডে আমাদের ছেলেটা।
আমার আজ কী আনন্দ, কী আনন্দ
প্রথম মাইনের টাকায় কেনা
তার এক হাতে মিষ্টি, আরেক হাতে মাছ।
দুচোখে স্বপ্ন।

কাল আমি ব্যথায় ভেঙে পড়েছিলাম।
আজ আনন্দে আটখানা।
মৃত্যুর পাশে মুখ বাড়িয়ে দেয় জীবন,
স্মৃতির পাশে স্বপ্ন।

হাওয়ার মুখে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রাত্রি যখন ফুরায়, তখন নদীর গভীর থেকে
হঠাৎ জাগে উল্টোপাল্টা হাওয়া।
যে চলে যায় নদীর ঘাটে পায়ের চিহ্ন রেখে,
এইভাবে তার কোথায় চলে যাওয়া,
হাওয়াই জানে, পাগলাটে ওই হাওয়াই সেটা জানে।
সেই গিয়ে সব খবর শোনায় বৃদ্ধ বটের কানে।

চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে আবছা অন্ধকার।
এই আঁধারে যে চলে যায়, তার
গোপন কথা ছড়িয়ে পড়ে এইখানে ওইখানে।
নদীর জলেও কাঁপন লাগে স্রোতের চোরা টানে।

হাড়ের খাঁড়া

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

উই একটি প্রাচীন প্রাণী। এই ব্রহ্মাণ্ডের আগে
জন্ম তার। গান গায় ভারতীয় মুনি, ভারতবর্ষ,
যেন উইঢিপি, ক্রমে চোখা হয়ে
আরো
উঁচুর
দিকে
উঠে যায়—
কীট ঝুরে গেছে মাংস, হুঁশ নেই স্তূপের ভেতরে
তেজোময় শাণিত হাড়ের খাঁড়া-ধড় মাথা হাত পা সমস্ত
অদৃশ্য,
শুদ্ধ
ঢিপির ফোকর থেকে তার দুটি জ্বলজ্বলে চোখ
দেখছে তাকিয়েঃ বুঝি কঠিন পাহাড়
বিদ্ধ
করে
চলে যাবে,
কিংবা বসে থেকে যুগ যুগান্ত বুঝে নেবে ব্যাসকূট,
যা আছে পাখির মধ্যে, গ্যাস লোহা গাছে ও মানুষে
পুকুর বাইরে শান্ত, সরলের নীচেও কী আবর্তসংকুল,
কতো প্যাঁচ একটি ধুলোয়, সূর্যে, শিশুদের গভীর চক্ষুতে,
ভাবতে গেলেই মাথা টলে যায়,
ভারত ভেবেছে সব,
চলো, মাছ ধরি।

শেষরাতের আকাশে

মণীন্দ্র গুপ্ত

অনেকদিন যায় যখন দেখা হয় না।
জলপাইগুড়ি থেকে পাঠানো চা সেখানকার শীতের বিকেলের মতো
মলিন হয়ে আসে।
গতবছর, বয়স ভুলে, শিলংয়ের বনের পীচ ফল পাঠালে—
সেই রক্তিম ক্ষতিপূরণ একটাও আমি মুখে তুলিনি,
একলা-বাড়ির ফ্রিজের কোণায় পড়ে থেকে থেকে শেষে নষ্ট হল।

চৈত্রপবনে যেসব গুজব ছড়ায়, রাত্রে পুরনো বইয়ের
অধ্যায়ের সঙ্গে সেগুলো নাড়াচাড়া করি—
গীতবিতানের গানের সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে
তাদের সুরে বসাবার চেষ্টা করি।

একদিন প্রণয়পানীয় খুঁজতে ডাইনীদের কাছে যেতাম,
এখনও রক্তাক্ত মেঘের বুকে আছড়ে পড়ার জন্যে পাহাড়চূড়ো খুঁজি।
ফল একই বয়স শুধু পদ্ধতি পালটে দিয়েছে।

সত্যিই কি আমাদের আর কোনোদিন দেখা হবে না!
তুমি ফ্লোরিডায় তো আমি গ্যালাপ্যাগোসে,
তুমি ভ্যাংকুবারে তো আমি ত্রিচিন্নাপল্লীতে,
আমি যখন আমার তেইশ সহস্রতম জন্মে ভাসমান তুমি তখন তোমার
উনিশ সহস্রতম মৃত্যুতে ডোবা।
তবু গতশরতের এক শেষরাতের আকাশ
আমাদের খুব কাছাকাছি এনেছিল—
তোমাকে দেখা গিয়েছিল কিরীটের মতো শুকতারায়
আর আমি ছিলাম তার ঠিক এক ফুট নিচে
চতুর্থীর হেলে পড়া চাঁদে।

পাখোয়াজ

শঙ্খ ঘোষ

বহুদিন ছিল আগুনখেলার দিন
বহুদিন ছিল জলোৎসবের তোড়
বহুদিন ছিল পথে পথে উড্ডীন
বহুদিন কত রাত হয়ে গেল ভোর।
শূন্যতা এসে শূন্যতে ছিল মিশে
একাকার সেই পূর্ণতা থেকে কত
বহুদিনকার দিনানুদিনের বিষে
অকাতর ওই মুখ ছিল উদ্‌গত।
সে-মুখের কোনো সীমানা ছিল না যেন
এ-কালে ও-কালে ছড়ানো হাজার সাজে
মূছিত হয়ে পড়ে ছিল সব জ্ঞানও
আধোরাত্রির দূরাগত পাখোয়াজে —
অশরীরী যত নাচের বিভঙ্গেরা
জ্ঞানহীন সেই শরীরে উঠেছে মেতে
ওই মুখ ছিল আমার দুহাতে ঘেরা
মগ্ন শিশির নগ্ন ফসলক্ষেতে।
ছন্দ আমার বুকের বাঁপাশে এসে
তুলে আনে আজ সেই রাত্রির ভার —
ও যদি ঘুমোয় ঘুমোক-না অক্লেশে
ভালোবাসি ছাড়া কী-বা ছিল বলবার!

পাহাড় জুড়ে পরাগপ্রহরীরা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শান্তি নয়, এখানে সাইপ্রেসে
বলতে পারো যুদ্ধ মূলতুবি,
তিরিশ হাজার তুর্কী ট্যাংক নিয়ে
সমুৎসুক, তাদের উল্টোমুখী

সৈনিকেরা গ্রীক ও সিপ্রিয়্যান ;
মাঝবরাবর স্নায়ব করিডর
পেরিয়ে গিয়ে হিলটন হোটেলে
মিনিট দশেক ব্রেকফাস্টের পর

ঠিক সময়েই সমুদ্রকিনারে
এসেছিলাম আফ্রোদিতের স্নান
দেখব বলে, দেখলাম সৈকতে
শুকনো খড়ির পাহাড় ব্যাপমান।

ফেনার ভিতর জন্মিয়ে ভুল যতো
পুরুষদের শরীর দিয়ে নারী
আফ্রোদিতে এখানে এসেছিল
আরেকবার অক্ষত কুমারী

হয়ে উঠতে ; প্রেমিক অ্যাডোনিস
নিহত হলে তার দেহে রমণী
যেখানে তার কান্না রেখেছিল
সেই পাহাড়ে ছেয়েছে অ্যানিমনি।

কোমলতম মমতা দিয়ে গড়া
এই ফুলের লাবণ্যরুচিরা,
তবু প্রেমের পক্ষে যুযুধান
দৃপ্ত তার পরাগপ্রহরীরা।

দেখা না-দেখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আজ আর ঘুম এল না, জেগে-জেগে দেখলাম ঘুমকে
এরকম হয়
মানস নদীর ধারে মাথায় চাঁদ-জাগা সেই এক রাতে
আর কিছুই দেখিনি, রাত্রিকেই দেখেছি
জীবনে দু-একবারই মাত্র এরকম দেখা হয় চকিতে
তেইশ বছরের সেই যে বুক-ফাটা, চোখভেজা
দুঃখ পাওয়া
যা নিয়ে লিখেছি বেশ-কিছু কবিতা
আজ বুঝতে পারি তার অনেকটাই ছিল ভুল
মেয়েটি নয়, সেই প্রথম স্বয়ং দুঃখকে দেখেছি স্বচক্ষে
বরাইবুরুর জঙ্গলে একটা ঝর্ণার ধারে-কাছে কেউ ছিল না
ঝর্ণাটি নিজেই সেখানে স্নান করছিল আপনমনে
যেমন একটা বই মাঝে-মাঝে পাতা উল্টে নিজেকেই পড়ে
একটা থেমে-থাকা গান নিজেকেই গানটা শোনায় কখনও
আগুন এক-এক সময় মুগ্ধ হয়ে দেখে আগুনেরই রূপ
আজও দেখতে পেলাম না দূর থেকে ভালবাসাকে
সমস্ত শরীর ছাপিয়ে তার এক পাশে নিঃশরীর দাঁড়িয়ে থাকা —

একটি কবিতা

উৎপলকুমার বসু

দোয়েল আমাকে বলে ঝটিতি এসব লেখা ধুয়েমুছে ফ্যালো।
ছন্নছাড়া পাখি ঐ, আমায় বলেছে কিনা বাঙময়, শেলেটে নাকি বাজে কথা লিখি,
আমি চাই সে এসে দেখুক, ক্রমাবনতির অক্ষর পড়ে নিক,
জেনে যাক লোহার বালতি কেন নামছে কুয়োর জলে
যে-গহ্বর জলহীন। কাকে বলা ?
ফিরে দেখি পাখি নেই, চাঁদ নেই, তারাও ওঠেনি,
শুধু রাত্রির তপ্ত বাতাস বইছে।

মৃত্যুবিষয়ক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

মৃত্যু মাঝেমাঝে এক ফালি শসা এনে এগিয়ে দিয়েছে
নুন-দেয়া, স্নিগ্ধ, চোখ জুড়িয়ে যাবার মতো, পরিমেয়, মৃত্যু
মাঝেমাঝে এসে বলেছে, বাদল এসেছে,
কোনো উত্তর দিইনি —
আবারও বলেছে সে, ঘোর কালো বাদল এসেছে,
কোনো উত্তর দিইনি।

সংবর্ধনা

আলোক সরকার

সেই একজন পান্থ
দুহাত উপুড় করে
ভিক্ষা দিচ্ছে।

আকাশ থেকে নেমে আসছে
খণ্ড খণ্ড শূন্যতা।
আর ভিক্ষার থলিগুলো
হিম সাদা বোবা তুষার রঙ।

চরাচর সম্পূর্ণ করে
করুণ কাতর রোদন।
তোমরা তাকে শুনতে পাচ্ছ?
কেউ তাকে শুনতে পাচ্ছে?

তোমরা একবার পথিকের পাশে দাঁড়াও
একবার ভিক্ষাপাত্রের পাশে দাঁড়াও।
যা কিছু নেই তাকে ব্যাপ্ত করে
বেজে উঠুক তোমাদের মূক শঙ্খগুলি।

পৃথিবীতে

বিনয় মজুমদার

পৃথিবীতে বাতাস রয়েছে।
পৃথিবীর বাতাস যদি লোপ পেয়ে যেত
তবে আমরা দেবদেবীগণ মানুষগণ
মরে যেতাম। ধরা যাক এই মুহূর্তে
পৃথিবীর বাতাস লোপ পেল,
পৃথিবীতে আর বাতাস থাকল না,
তবে এই মুহূর্ত থেকে এক ঘণ্টা যাবৎ
বাতাসহীনতার জন্য সব মানুষই মরে যেতাম
সব মানুষই মরে যেতাম, একজনও আর
জীবিত থাকতাম না। এর ফলে বোঝা যায়
বাতাস আছে বলে একজন মানুষের
সঙ্গে অন্যসব মানুষের যোগাযোগ রয়েছে—
সম্পর্ক রয়েছে। বাতাসহীনতার শুরু থেকে
এক ঘণ্টা বাতাসহীনতা চলার ফলে
আমি মরে যেতাম এবং সব মানুষই
মরে যেত কেউ বেঁচে থাকত না—
এইটেই প্রমাণ করে যে বাতাস আছে বলে
একজন মানুষের সঙ্গে অন্যসব মানুষের
যোগাযোগ রয়েছে সম্পর্ক রয়েছে।
এর পরে অন্য ভাবে
ভাবা যাক—এই মুহূর্ত থেকে বাতাসহীন
হলো পৃথিবী এবং পঁচিশ সেকেন্ড পরে
আবার পৃথিবীতে বাতাস এলো। ফলে
বোঝা যায় পৃথিবীর সব মানুষ মরতে
মরতে বেঁচে গেলাম। বাতাস আছে বলে
পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে।
পাঠক, নিজেই ভাবুন;
দেখলেন আমরা মানুষেরা আসলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই না।

মিথ্যে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সামনে বসানো রামের পাঁইট
প্লেটে মাংসের চিলতে,
লিখতে বসেছি। লিখতে বসেছি। লিখতে।

নোটিশ ঝুলিয়ে রেখেছি—'সরি টু রিগ্রেট',
শুধু আয়োজনে বেলা বেড়ে যায়
প্যাকেটে বিদিশি সিগ্রেট,
মাথার ভেতর মেঘ নেই তাই কলমে বৃষ্টি আসে না,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিপাট শাদা রয়ে যায় খাতা,
বড় বেশিদিন নিজেকে ফাঁপিয়ে রেখেছি আদিখ্যেতায়।

ডাকার আগেই লাফিয়ে উঠত
যে-সব আঁকাড়া শব্দ,
আজ হেটমাথা, পিছমুড়ে বাঁধা, জব্দ।
আকাশে বজ্র গর্জায়,
এবারের ধান লুট হয়ে গেছে গত বছরের কর্জায়
কবিতার নামে সাজিয়ে সাজিয়ে বোকা অন্ত্যক্ষরী
দিনশেষে স্রেফ গোধূলিবমন করি।

মদমৈথুনেমুদ্রায় যত ভাসছি তুমুল রঙ্গে
ততই ছিঁড়ছে নাড়া জীবনের সঙ্গে।
একদিন যারা কাছে এসেছিল ডিজেল গন্ধ মাড়িয়ে,
শরীরে যাদের মিৎসুবিশির ট্রাক সারি সারি দাঁড়িয়ে,
আমারই অমনোযোগিতায়
গ্রাম-জনপদ-শহর-গঞ্জ নিয়ে তারা দূরে দূরে যায়
ব্রেনের ভেতর মরা কানামাছি
আয়োজনে ঠাসা মিথ্যে—
লিখতে বসেছি। লিখতে বসেছি। লিখতে!

ফুল-ফুল-ফুলটি

তারাপদ রায়

একটু আগে পাথরে ফুল ফুটেছিলো,
প্রথমে গড়ন দেখে ভেবেছিলাম, বোধহয় জবা,
সেই আমাদের বাল্যসখী।
সাহেব পাড়ার মেয়ে জবা
হাই হিল জুতো পরে সাঁকো পার হয়ে আসতো,
আমরা বলতাম, 'মিস হিবিসকাস'।

কিন্তু পাথরে লাল রঙ ফুটলো না।
ধীরে ধীরে ছেনির নিখুঁত আঘাতে
একগুচ্ছ সাদা টগর ঝলমল করে উঠলো।

জবার বদলে টগর, কিন্তু আমি দুজনকেই চিনি।
ব্রহ্মপুত্রের চরে চৈত্রমাসে হরিপাগলার মেলায়
বিন্নি ধানের খই কিনতে গিয়ে,
হৈচৈ ভিড় আর দোকানপাটের মধ্যে
আমি একবার ছোটবেলায়
টগরপিসির হাত ধরে হারিয়ে গিয়েছিলাম।

কিচ্ কিচ্ শব্দ হচ্ছে, পাথরের গুঁড়ো উড়ছে,
ছেনি চলছে, অবিরাম ছেনি চলছে।
পাথরের ভেতরে এবার চাঁপা রঙ ফুটছে।
ভয় পেয়ে গেলাম, বুঝতে পারলাম চাঁপা আসছে।
চেঁচিয়ে উঠলাম, 'চাঁপা, চম্পা, চম্পা বেগম,
তোমার কি এখনো বয়েস বাড়েনি,
এভাবে লজ্জাহীন নিরাবরণ ফুটে উঠছো?'

কিন্তু কে কার কথা শোনে?
ছেনি চলছে, পাথরের গুঁড়ো উড়ছে,
ফুটে উঠছে নিরাবরণ চম্পাবেগম।

আলগোছে জীবন

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

দু-পাশে মায়েরা, আমি মাঝখানে, সামনে লাল গেট।
ফোকর-ফাকর দিয়ে যতটুকু দেখা যায়
যত দূর দেখা যায়—
ক্লাস অবধি পৌঁছে গেলে তখন নিশ্চিন্ত।

সকালের মেয়ে-স্কুল—সাত বছর, আট বছর
এই সব ছাত্রী।
ন্যাড়া মাথা, ভাঙা দাঁত, রং-চটা জামা
পিঠের বস্তায়
দু-চারটে খাতা বই, জলের বোতল, আর
মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে ভরে দেওয়া সিঙাড়া জিলিপি জিবেগজা।

ঘণ্টা বেজে গেল। এক ফোকলা মেয়ে
একটু ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আবার ফিরে আসছে। কেন?
কী হলো রে? তার চোখে জল
তার গায়ে জ্বর। দিদিমণি ওকে বকেছেন।
আমার কিছু না, তবু গেটের ফোকর দিয়ে শিশুরানী দেখি,
লোকেরা যেভাবে
বাগান ও ঝর্না দেখে মুগ্ধ হয়, আমি মুগ্ধ হই।
আমি ভাবি, বহু ভুল সংশোধন করে যিনি বিশ্ব গড়েছেন,
যিনি এর নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন
প্রহরে প্রহরে, যুগে, কালান্তরে আবর্তিত তাঁর তীক্ষ্ণ অঙ্কের আঙুল

বিশেষ কোথাও
একটু বেশি মনোযোগ দেয় কি না।
কার্যকারণের চক্রে আটকে যাওয়া অসুস্থ বালিকা
এখন কি বসে থাকবে মা আসা পর্যন্ত? নাকি
বাড়ি পৌঁছে দেবে কেউ? কখন? আরেকটু দেরি হলে
বাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। মা-বাবার আপিস আছে না?
তিনতলার বাড়িউলি বুড়ি

দ্রুত ও ধাতব এই জীবনের মধ্যে এক ভাসমান দ্বীপ,
ঠিক দ্বীপ নন,
পৌরাণিক অভিধান, এপিক, তাঁকেও
অঙ্কের আঙুল সামলে ধরে আছে কিনা, আমি ভাবি।
ডাইনে বাঁয়ে ছোট ছোট মায়েদের দিকেও তাকাই।
হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা নেই।
কেউ সাতাশ, বত্রিশ
পিল খেয়ে খেয়ে ওরা সচ্ছলতা বাড়াচ্ছে সংসারে—
আলগোছে জীবন,
কিন্তু ভারসাম্য ঠিক টিকে আছে।
শহরের খোপে, গাছে, গ্রামের জঙ্গলে, ইশারায়
সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে বিবর্তন চলছে খুব ধীরে।

যবনিকা

মানস রায়চৌধুরী

সমুদ্র গুটিয়ে নিলো নীলাভ চাদর
পানীয়ে এখন ছায়া নেমেছে কী ঘোর
গর্বিত আকাশ থেকে নেমে আসে স্বর্গীয় সুষমা
প্রায় ধর্মগ্রন্থ যেন, এইভাবে ঢেকে ঢুকে চলা
যতো ক্রোধ হোক তবু বলতে হবে, ক্ষমা
ভিতরে ভিতরে সব দাহ নিয়ে তীব্র, তীব্র জ্বলা।

একদিন তো এসবের হবে অবসান
বাল্য কেটে গিয়ে আসবে যুবকের স্পর্ধার দুপুর
পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে দেখা দেবে প্রাণ
মন উড়ে গেছে মহাশূন্যে, শূন্যে তার শেষ অভিযান
তারপর বৃষ্টিতে আকুল হয়, দূর
যবনিকা উঠে গিয়ে তোমাকেও শিশু করে তোলে
জানো সেই ছায়া ঘিরে তোমার সর্বস্ব ছিলো বলে
আমিও ফিরিয়ে নিই আমার কুয়াশাভরা লোভ
রৌদ্রে সব মুছে যায়, না মুছলে ভালো ছিলো এইটুকু ক্ষোভ।

শব্দমূল্য

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শব্দ আজ তার কাছে শুধু লঘুক্রিয়া।
অন্ধকারমাখা দ্রুমদল, সমুদ্রসান্নিধ্যে জাগা শঙ্খের ভোঁ,
রঙ্গনটি নারীটির অতুলনীয় বাম গালের তিল
সবই কি শ্রীরামের দেওয়া তাই
স্পর্শ করে ছুঁয়ে ছেনে দেখতে এত ভয়
হায়! এ সবের জন্য খুব শ্রম হয়েছিল একদিন
উত্তরীয় খুলে তাকে মাথায় পাগড়ী করে পড়ে
তোমাকেই চাই, আরো আরো চাই বলে পাহাড়ে গিয়েছো
জলধির কাছে গিয়ে দীর্ঘকাল দেখেছো কি করে
ঢেউ ভাঙে ঢেউ গড়ে, ঝর্ণা আর সানু পাথরের
শুনেছো নানান কথকতা! আজ
কিছুই শোনো না তুমি, মুদ্রাও এখন আর
সে রকম ধাতুশব্দ নয় বলে
শব্দের ফুটনোট থেকে তুমি কারেন্সিনোটের অভিধায়
চলে গেছো, চলে গিয়ে জ্বলে গেছো,
তোমার শ্মশানঅগ্নি তাই আজ আর নিজে
দেখতেই পাও না! একটি শব্দের দাম
সমুদ্রিত একাধিক অশোকস্তম্ভও আর চেনাতে পারে না!

মেয়েটা

নবনীতা দেবসেন

দুঃখ তাকে তাড়া করেছিল
মেয়েটা ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে
কী আর করে? হাতের চিরুনিটাই
ছুঁড়ে মারলো দুঃখকে—
আর অমনি চিরুনির
        একশো দাঁত থেকে
গজিয়ে উঠলো হাজার হাজার বৃক্ষ
শ্বাপদসংকুল সঘন অরণ্য, বাঘের ডাকে,
ছম্ ছম্ অন্ধকারে,
কোথায় হারিয়ে গেল
দুঃখ —

ভয় তাড়া করেছিল তাকে
মেয়েটা, ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে
কী করে? মুঠোর ছোট্ট আতরের শিশিটাই
ছুঁড়ে মারলো ভয়কে—
আর অমনি সেই আতর ফুঁসে উঠলো
ফেঁপে উঠলো ফেনিল ঘূর্ণিতে, প্রখর কলরোলে
যোজন যোজন ব্যেপে, হিংস্র গেরুয়া স্রোতের
তোড়ে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল
ভয়কে—

প্রেম যেদিন ওকে তাড়া করল
মেয়েটার হাতে কিছুই ছিল না
ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে, কী করে?
শেষে বুক থেকে উপড়ে নিয়ে হৃদয়টাকেই
ছুঁড়ে দিল প্রেমের দিকে,
আর অমনি
শ্যামল এক শৈলশ্রেণী হয়ে মাথা তুলল
সেই একমুঠো হৃদয়

ঝরনায়, গুহায়, চড়াইতে, উতরাইতে
রহস্যময়
তার খাদে, তার উপত্যকায়
প্রতিধ্বনি কাঁপছে
ঝোড়ো বাতাসের, জলপ্রপাতের—
তার ঢালুতে ছায়া, আর
চুড়োতে ঝলসাচ্ছেন
চাঁদ সূর্য্যি
সেই ঝলমলে, ভরভীত হৃদয়টাই
বুঝি এগোতে দিলে না
তার প্রেমিকের ভীতু
প্রেমকে,
আহা

এবার ওকে তাড়া করেছে ক্লান্তি
হাত খালি, বুক খালি,
ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে, কী করে?
এবারে মেয়েটা পিছন দিকে
ছুঁড়ে মারলো শুধু দীর্ঘশ্বাস—
আর অমনি
সেই নিশ্বাসের হলকায় ফস্ করে
জ্বলে উঠল তার সমস্ত অতীত
দশদিশিতে দাউ দাউ ছড়িয়ে পড়ল
উড়ন্ত পুড়ন্ত বালির মরুভূমি

এখন মেয়েটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটছে,
দুই হাত মাথার ওপরে তোলা—
যাকু
এবার তাকে তাড়া করেছে, তার
গন্তব্যটাই।

দাহ

সুনীলকুমার নন্দী

রয়েছে পিছনজোড়া যত বিফলতা, যত
ছলনাকুহক, যত খসে পড়া ভূমি
কুরে খাওয়া স্মৃতিভার নামাতে এখানে এসে
পাথরে পেতেছি বুক ; পাহাড়ের গায়ে

গড়ানো জলের ধারা কিছুতে পারে না যেন
সরাতে, যে-জমে থাকা ভিতরের দাহ

জেনেও, অথচ কেন আছি এই ধূমল পাহাড়ে?

হয়তো অলসটানে আছি এতদিন

তাছাড়া কোথায় যাবো? মাঝে মাঝে মনে হয়
গোধূলির মতো যদি সমুদ্রের জলে মিশে যাই

শরীরে উদ্দাম জল মুছে নেবে ভিতরের দাহ!

পূর্ণেন্দু পত্রী

আত্মচরিতের পাতা উড়ে যাচ্ছে খানা-খন্দে, খাদে, বিস্ফোরণে,
জঙ্গল-জটায় ছিঁড়ছে, কিছু খড়-কুটো হয়ে মাটির জলজ স্নেহে ভেজে।
অসন্তুষ্ট অক্ষরেরা চেয়েছিল আরো খাদ্যপ্রাণ,
গ্রন্থের সম্মান তারা চেয়েছিল, চেয়েছিল রাজকীয় বিছানার মতো সংবর্ধনা

তপস্বী প্রভাত! হায়, তুমিও চক্রান্তে অংশ নিলে?
নইলে কি করে পারলে দরোজায় অবিলম্বে উচ্ছেদের নোটিশ টাঙাতে?
দম্ভের এ পরোয়ানা রক্তে যেন বর্শা হয়ে বেঁধে,
বিদীর্ণ কপালে চুল পুড়বার আগুনের উদভ্রান্ত আঙুল হয়ে ওড়ে।

'হাত ধরো, পড়ে যাচ্ছি', এমন চিৎকারে কেউ দৌড়ে-ছুটে এসেছিল কিনা
ভুলে গেছি, শুয়ে আছি সোপার্জিত স্থাপত্যের ভগ্নাংশের কোলে।
ডাক্তার এসেছে, তাঁর স্টেথিস্কোপ বুকে গেঁথে গেছে,
আরো বড় ডাক্তারেরা নলকূপ খুঁড়ে গেছে বিস্তর গভীরে।
হোমিওপ্যাথিক এসে জেরবার করে গেছে প্রশ্নে প্রশ্নে, স্মৃতিমন্থনের
শাদা জল ঘোলা করে তাঁর জন্যে বিবরণ লিখে দিতে হবে
প্রথম স্বপ্নের গায়ে কী রকম বিচ্ছুরণ ছিল।
সে সর্বগ্রাসের সুখ কে তখন নিক্তি মেপে ওজন করেছে?
স্বপ্নেরও ক্যান্সার হবে তাই-বা কাদের জানা ছিল?

কবিতা সিংহ

তার চেয়ে শ্রেয় এ নগ্নতা
নগ্নতার খোলা তলোয়ার
বড় বেশি ঝলসে দেয় চোখের চামড়া
চোখ খায় ভীষণ তক্ষক!

'ক্যাট্ ওয়াকে' দাঁড়ায় মডেল
ত্রি-ভঙ্গ শরীরে তার, ডাকটিকিটের মতো
সাঁটা থাকে টুকরো কাপড়
যেন সে শরীর খামে ছড়াতে ছেটাতে থাকে
আমন্ত্রণ লিপি।

দেখো তুমি নগ্ন নারী নির্ভেজাল ওখানে যেও না
ওখানে হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের লেলিহ আগুনে
ঝলসে উঠবে উরু খড়্গ বাহুর কৃপাণ
আলোর তমসা বড় হীন লজ্জা দেবে!

তার চেয়ে নগ্ন হও নারী
দেহ বেচে গয়না আর শাড়ি?
খুলে নাও একখানি দধীচি-পাঁজর
হোক শুধু সত্য-বজ্রপাত

অযৌন-নগ্নতা পরো
নিজেকে সম্মানিত করো হে রমণী!

কাল ছিল পঁচিশে বৈশাখ

শিবশম্ভু পাল

পঁচিশে বৈশাখ কেন মনে থাকে ? মন আছে বলে।
মন থাকে কোনখানে ? ঈশ্বর আকাশে যদি, মন তবে পাঁজরার ভেতর
স্নায়ুর আড়ালে খেলছে ফেলে দেওয়া পলিপ্যাক, পোড়া সিগারেট
ফাঁকা কার্তুজের খোল কুড়িয়ে-কুড়িয়ে গড়ছে সুখনিদ্রা, নিদ্রাহীনতার
তোড়জোড় অশ্রুময় পিছু হাঁটা, অগ্নিময় প্রতি-আক্রমণ
পঁচিশে বৈশাখ, সেই ছাব্বিশে বৈশাখে মালা-ফেলে-দেওয়া বাসি
উত্তেজক, ঠান্ডা জল চায়ের তলানি, কাপ-ধুয়ে-ফেলা নৈর্ব্যক্তিকতার
চব্বিশে বৈশাখ আর ছাব্বিশের মাঝখানে একটুখানি খোঁচা
একটুখানি জোড়াসাঁকো, শ্রেয়বোধ, পাড়ার ফাংশন
এঁদোঘরে এসেছিল ঝকঝকে লিমুজিনে বড়লোক মামা
তারপর চলে গেল, বিদায়ের রাত্রি থেকে ভোরে
ছাব্বিশে বৈশাখে মালা জঞ্জালের ক্যানে ফেলে মনে করি কাল
পঁচিশে বৈশাখ ছিল, এভাবেই উল্টো করে, নেতির গরজে···

এককাতে শুয়েছে বঁটি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এককাতে শুয়েছে বঁটি, ঘুমোনো হেঁশেল—মা তখনও
বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলছিলেন···
মেঘ থমথম করছে বাইরেটা, ভেতর দেয়ালে
ঘুণপোকা ডাকছে প'ড়ে একটানা।
অপথ চললুম। দাওয়াধারে বসে আছি।
পুরোনো কাসুন, ফটো, ছেঁড়া ভাঙা ছড় আর এস্রাজ
আধপোড়া ছড়িয়ে যায় অসুখ মেঘলাতে।
চিঠি আসল না আজও ? পাশ হওয়া হল না ?
একটাও হল না ? ছাদ, দেয়াল, বাইরে গাছলতা,
আলো, পা-র নীচে মাটি—নারাজ, নারাজ ! হাত ধ'রে
বিদেয় দিয়েলুম প্রেমিকাকে। দাওয়াধারে বসে আছি।
অন্ধকার সমুদ্র আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে দশ হাতে।

বঁটির আছাড় আলগা হয়ে এল। পাঁচপদ ব্যান্নে
সর পড়ছে। ছেলের খাটখানা ফাঁকা প'ড়ে।
রাতজাগা বারান্দার কোণ ধ'রে মা তখনও
দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর হার হওয়া ছেলের অপেক্ষাতে—
আগুন চন্নন মুখখানা জ্বলছে যেন।
খোলা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে চোখে পড়ে বিভানিষুতির অবয়ব।
খোলা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে অনন্ত শেষহারা ধাপ ধাপ
ফুটন্ত তারায় ধ'রে ধ'রে উঠছে দুর্ভাগ্যের মুখ—

মনে পড়ে। লতাফুল খোঁচা দিয়ে উঠছিল ঠান্ডা ওয়াড়ে,
সবজীর পাথর ডুমো বুকে বেধে আছে সারা রাত—
মনে পড়ে—চুল্লির খাঁচার অন্ধকার মুখটাতে
অনন্ত অনন্তকাল চেয়ে আছি, অকুতী পাথর।

স্লেটপুকুর

রঞ্জিত সিংহ

ও বিপুল — বিপুল — তুই এখানে ?
আমায় ছেড়ে এতদিন কোথায় ছিলি বাছা ।
চারদিক তাকিয়েও —নাঃ, কোথাও কেউ নেই ।
নীলচে স্লেটরঙ গোলপুকুর, লঙ্কাজবা মালা
প্রবালের মতো পুকুরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো,
ঘন জঙ্গলের ঘের, দিনের বেলাতেও রাত্তির ।
ও বিপুল — বিপুল — তুই এখানে ?
কোথা থেকে এই ডাক ?
পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছি একটা পারুল গাছে ঠেস দিয়ে ।
হঠাৎ চমকে দেখি পাশেই দাঁতটাত নেই, শণের মতো চুল,
ময়লা ছেঁড়া থানপরা একটা বুড়ি ঝকঝকে চোখে
আমার দিকে তাকিয়ে ।

একটু রেগেই বলে উঠলাম —তুমিই বুঝি বিপুল বিপুল বলে ডাকছিলে ?
আমি বিপুল নই ।
অমনি বুড়ির খো খো শব্দে প্রচণ্ড দমফাটা হাসি ।
তুই আমার বিপুল নস ? না হয় তুই এবারে নিরঞ্জন ।
অবাক হলাম, আমার নাম তো নিরঞ্জনই । বুড়ি জানল কী ক'রে ?
বুড়ির আবার সেই হাসি ঃ তোর সব জন্মের সব নাম
আমারই দেওয়া ।
তুই তো আমার পেটের ছেলে, আবার সময় হলে এই পেটেই তোকে
পুরে রাখব ।

তারপরই সেই জলে টুপ ক'রে কেউ যেন ডুবে গেল ।
আমি এত কাছাকাছি, তবু বুড়িটা অজান্তে বেপাত্তা ।
'কালীদিঘি'—এই নামটা ঝক্ করে মাথায় খেলে যেতেই
আমি আর পুকুরের থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি ।
আজও ঠায় বসে ।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখি ঐ লেপাপোঁছা জলের গায়ে
একটা আবছা মুখের আদল সন্ধে হলে ভেসে ওঠে ।

কেউ যেন প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতির আলো
দেখায় । যেখানে আলো সেখানেই লঙ্কাজবা রক্ত প্রবালের মতো
ঝিক দিয়ে ওঠে । একটা হাওয়া দেয়, অমনি জলের গায়ে
একটা আবছা মুখ স্পষ্ট হতে হতেই পুরোটাই ভেঙে যায় ।

দিনরাত পুকুরপাড়ে আমার এই বসে থাকাটা পথচারীরা লক্ষ্য করেছে ।
বলেওছে ঃ দিনরাত কালীদিঘিতে চেয়ে কী দেখেন । ভালো না, বাড়ি যান ।
আমি যাব কোথায় ? সবই তো আমার বিস্মরণ ।
ওদের জিজ্ঞেসও করেছি —এই বুড়িটা কে বলুন তো ?
ওরা আমতা আমতা করতে করতে চলে যায় ।

শোন্ বায়ুরূপ ধূপ, তেজোময় দীপ —আমি নীল সরস্বতী ।
পুকুরের জল ভেঙে ভেঙে কথাগুলো লাফ দিতে দিতে উঠে এল ।
আমার তুই বিপুল, আমারই তুই নিরঞ্জন, আবার যখন পরীক্ষিত হবি
তখনও আমারই —এর কি ইয়ত্তা আছে ?

তুমি কি এইখানে এই ভাবে নীলচে পুকুর হয়ে থাকো ?
সেই খো খো হাসি ঃ কত নীল পুকুর হয়ে আছি ।
গর্ভে এলেই আবার জানতে পাবি—এ পুকুরের চৌহদ্দি নেই ।
নীল ঠাণ্ডা জলে শুধু ভেসে বেড়ানো, ভেসে ভেসে আমাকে দেখা,
আমাকে হারানো, আবার দেখা···
বড় সুখের খেলা —এ সুখের কি তুলনা আছে ?

হরিণ

দিব্যেন্দু পালিত

মৃত হরিণীর পাশে শুয়ে আছে অমৃত হরিণ
শুয়ে শুয়ে কি ভাবছে এই নিয়ে শুরু হয় খেলা
প্রণয় বিদ্ধ হলে সেও বধ্য হবেই এ কথা
হরিণ যতটা জানে তারও বেশি জানে শিকারীরা।

তবুও হরিণ তার স্থিরতায় ঢেকে রাখে মুখ
গাছের ভিতর গাছ ছায়া দেয় মৃত্যুর ভিতর
আলো কিংবা আলো নয় এরকম দ্যুতিও ছড়ায়
মৃত হরিণীর ঘ্রাণ হাওয়ায় অর্বুদ করে ঋণ।

এভাবে আমরাও চলে যাব ওই হরিণের কাছে
শুধুই অশ্রু নিয়ে কেন না অনেক হাত বন্দুক চিনেছে
যে-ভাষা অবোধ্য তাকে ছিঁড়ে পেতে গবেষণা দিতে—

তখনো কবিতা ছিল মৃত্যুর পরেও থেকে যাবে।

যে সব ভাবনা

ভাস্কর চক্রবর্তী

নদীর কথা প্রায়ই শুনি, ব্যাপারটা আমাদের জীবন থেকে
চুকেবুকে গেছে।
আমরা আর নদীর কাছে যাই না।
গঙ্গা নদীটা কলকাতার পাশ দিয়েই তিরতির বয়ে চলেছে
আর ওদিকে গোদাবরী চলেছে—তিস্তা-তোর্সা
চলেছে আরেক দিকে।
আমাদের আর নদী দেখার সময় নেই
আমাদের আর গঙ্গার ধারে উদাস হয়ে বসার সময় নেই।
হাজার হাজার মানুষ গিজ গিজ করছে শহরে
পাগলের মতো ঘুরছে
আর বাজারদর বেজে উঠছে তবলার মতো।
কাদের জন্যে এই মুল্যতালিকা?
প্রতিটি মানুষই, আমি তাকিয়ে দেখি, মুকুট পরতে চায়
তল্পিবাহক চায়
সিগারেট কিনতে পাঠায় ছেলে-ছোকরাদের।
কয়েক বছর চড়ুইগুলোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না আর
শালিখগুলোই বা কোথায় গেল?
সেদিন বাসের জানলায় যোগেন চৌধুরীর আঁকা অবিকল এক
নারীকে দেখলাম, আমার দিকে
একখণ্ড মাদকতা নিয়ে তাকিয়েছিল।
মাননীয় দীর্ঘশ্বাস, হাতে তৈরি কাগজ ব্যবহার করুন, গাছেদের
বাঁচান...গাছপালাদের বাঁচান...
কিন্তু মশাই, আমাদের বাঁচাবে কে?
কে কুত্তার বাচ্চা, রাস্তায়, তার একটা জোরালো হিসেবনিকেশ চলছে

আর এই যে আমি ঘুপচি একটা ঘরে
থেকে থেকেই স্বপ্ন দেখছি
স্বপ্ন দেখছি, তিনশো বছর চারশো বছর বেঁচে থাকবো
কী মূর্খতা।
কী পাগলামো একটা।

সন্ধ্যা উতরে গেলে

দেবারতি মিত্র

জলের ধারে জন্ম-জন্ম কে আমায় ডেকে নিয়ে আসো—
সরসর সাপের চলার শব্দে বয়ে চলেছে নদীর স্রোত।
হলুদ জবায়-জবায় পশ্চিম আকাশ ভেসে যাচ্ছে
মালা গাঁথা না-হতে-হতেই এক-একটি ফুল
বদলে যাচ্ছে জবাগাছের পাতায়।
মাথার উপর সন্ধ্যাবেলার ঘনিয়ে-থাকা মেঘ,
কোথাও কেউ নেই,
টিট্টিভ পাখির গলা গতজন্মে শোনা মায়ের ডাক
মিলিয়ে গেল অশথগাছের বুকের পাশ দিয়ে।
জলের বারণ নেই, সে বয়ে চলেছে—
দিগন্তরেখা তার বোন নয়,
কারুর কোনও আদল খুঁজে পাচ্ছি না।
আলো চোখের তারার মতো কালো হয়ে
ডুবে যাচ্ছে স্রোতে।

আস্তে-আস্তে কে এসে দাঁড়াল,
গাছগাছালির ছায়া, আকাশের ছায়ার সঙ্গে
তাকে আলাদা করা যায় না—
হাঁটু গেড়ে বসল নদীর ধারে
চুপিচুপি আঁচল থেকে মনসাপুজোর
ধূপধুনো স্তূপ নৈবেদ্য
বা মরা সন্তানের শেষ চিহ্ন না চোরাই সোনা
বা চোলাই মদ ঢেলে দিল
কিছুই জানে না নদী।
শুধু সভ্যতার কান্না-জরজর নদীকে এখন
জবাগাছের পাতার থেকেও থমথমে গম্ভীর
দেখায়, সন্ধ্যা উতরে গেলে।

শাদা বিছানা

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

বৃষ্টি পড়ছে,
শাদা বিছানা, আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো আবার।
যেমন বের হও প্রতি রাতে,
শীতে-গ্রীষ্মে, হেমন্তের মাঠে
কুয়াশায়, ঘন বনে, ঘাসের জঙ্গলে।
শাদা বিছানা, তোমার কি মনে আছে?
মাটির ভেতর সেই শুয়ে থাকা মেয়েটির কথা,
এতদিনে রূপবতী হয়েছে নিশ্চয়। মনে আছে?
শাদা বিছানা, আমি তোমার কথাই শুধু ভাবি
অকাজ ও কাজের মধ্যে
কুজো কুজো মানুষের ভীড়ে
রোঁয়া ওঠা রাস্তা থেকে শূন্যে যেতে যেতে
তোমার কথাই শুধু, তোমার কথাই মনে পড়ে।
কত কি দিয়েছো আমাকে প্রতি রাতে, যদিও ভয়ংকর
তার কিছু কিছু। সেই যে লোকটি
আমার সামনে হাসতে হাসতে নিজেই নিজের পেটে
ছুরি মেরে নাড়িভুঁড়ি বের করেছিল, সেই যে মেয়েটি
চিনতে পারিনি বলে অভিমানে
ডানা বার করে
উড়ে মিশেছিল মেঘের ভেতর, আর সেই যে কিশোর
হুবহু আমার মুখের ছাপ নিয়ে জলের ভেতর থেকে
উঠে এসে টেনেছিল হাত ধরে
জলের গভীরে—
এসবই, শাদা বিছানা, সবই তোমার জন্যে।
এখন অনেক রাত, বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
বৃষ্টি পড়ছে, ডুবে যাচ্ছে শহর
ডুবে যাচ্ছে ঘর বাড়ি রাস্তা ঘাট আলমারি টেলিফোন
ডুবে যাচ্ছে হাতপাখা কবির দাঁতের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ঠোঁট—

শাদা বিছানা,
চলো, আবার বেরিয়ে পড়ি অনেক সময়ের জন্যে
ছুঁয়ে আসি সেই ছোট্ট চোখ বোজা মেয়েটির বুক
মাটি খুঁড়ে যাকে মাটির ভেতর
একা রেখে কে কোথায় হারিয়ে গেলাম। শাদা বিছানা,
চলো, নিয়ে আসি তাকে।

বাজপাখি

কালীকৃষ্ণ গুহ

রূপকথা জন্ম নেয় এক
এরিয়েলে বসে বাজপাখি
সব পথ ঘুরে দেখেছে সে
এখন বিশ্রামটুকু বাকি

এখন সকল আবরণ
খসে যায় বিমূর্তের পাশে
বাজপাখি স্তব্ধ এরিয়েলে—
দিন যায় রাত্রির আকাশে

দূশ্যের গভীরে বসে একা
যে জেগেছে মন্ত্রের অতীত
তাকে আজ স্পর্শ করবো ভেবে
স্পর্শ করি নাভিমূল, ভিত।

বিশ্রামের কাল শেষ হলে
অন্ধকারে কে তাকে জাগায়?
এই প্রশ্ন ঘিরে বাজপাখি
আহত শক্তির দিকে যায়…

গীতা চট্টোপাধ্যায়

['অন্ধকার প্রদেশ, যেখানে আলোও অন্ধকারের মতো'— বাইবেল]

মৃগীও চরে না এতো নির্জন প্রদেশে সেই বাড়ি।
দেবতারা ভয় পান নিঃশব্দ চরণে শব্দ হলে
নিষিদ্ধ ফলের দিকে আকর্ষণ কে করবে সাহসী
এমন তো কেউ নেই প্রকৃতি পাথরে বাধা পায়।
অর্ধবৃত্তাকার স্তব্ধ আর্চগুলি ঘেঁষে গায়ে গায়ে
শ্বেতপাথরের রাজ্য ছায়াদের সমান বয়সী
সবুজ জালতির ফাঁকে অতিবৃদ্ধ চড়ুই ঘুলোলে
আবলুসের দ্রাক্ষাকুঞ্জে সিংহ থাবা পাহারা টেবিল।

ত্রিদশ দেবতা আর পিঙ্গলাক্ষী প্রতিহারিণীরা
রূঢ় হাতে রক্ষা করে পুরাতন রূপসী মহলে
বন্ধ্যা হয়ে আসে তবু কখনো হলো না জানলা খোলা
আগে কোনো গোলাপের বাগান ছিল না এই স্থলে
গোলাপের নাম এরা এর আগে শোনেনি বধিরা
গোলাপের দিকে মৃত্যু বরণ করেনি তিল তিল।

শুধু রক্ত-ভয়ঙ্কর নিষিদ্ধ দেয়াল বুকে তোলা
একদিন এক-পাগল ঘুরে যাবে তবু সেই বাড়ি।

পিছু ফিরে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

শান্তি কি বনস্পতির আড়ালে।
এখানে ঝরনার শব্দ স্তিমিত হয়ে আসে।
জলে আকাশ নেমে আসে।

যাবার সময় পিছু ফিরে দেখি
দিগন্তের মাটি ভেদ করে
একটি রক্তাভ চাঁদ
উঠে এল।
কোথাও কখনো কি শস্য ছিল না।

জ্যোৎস্নায় পৃষ্ঠপোষক উদ্বেগ
ছড়িয়ে দিয়ে
বনভূমি ঘুমিয়ে পড়েছে।
আমি কুড়োতে কুড়োতে
একবার পিছু ফিরে চাই
গন্ধরাজ ফুটে আছে কিনা।

সন্ধ্যার পেছনে রাত্রি,
রাত্রির পেছনে অবসান
অবসানের ভিতরে
আবার উন্মেষ।

রাত্রি আমার মাংস খুলে নিয়ে
হাড়গুলো আগুনে ছুঁড়ে দেয়
কিন্তু পোড়ে না।

সঞ্চয় বলতে তো কিছুই নেই।
অঙ্কুরিত হবার
সময় কি এখনো আসেনি।
শেষপর্যন্ত একাই যেতে হয়।
শস্য পেরিয়ে পাহাড় পেরিয়ে

নদী পেরিয়ে
একা।

যেতে যেতে নত হই—
প্রজাপতির কাছে, শামুকের কাছে,
বৃক্ষবেদনার কাছে,
নত হই
সেই কখন আমার সমস্ত জামার বাইরে
চন্দ্র অস্তাচলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিব্বত

অরুণেশ ঘোষ

[রাহুল সাংকৃত্যায়নের বিস্মৃতির উদ্দেশ্যে]

কোনাকুনি হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হবে পাথুরে উঠোন
জরাজীর্ণ মালভূমি ছিঁড়ে খুঁড়ে সূর্য ওঠে, তিব্বত! তিব্বত!
ভ্রূণ ছিল ভবঘুরে? নাকি তারও আগে ভবঘুরে ভ্রাম্যমাণ ছিল শুক্রকীট
আমার সেই আমি-অণু খুঁজেছে নির্দিষ্ট গর্ভ পার্বত্য জননীর
আজ আমি ক্রোধবশে ফেলে রেখে পাতানো সংসার
যেখানেই যাই, কিছুটা পানীয় রেখে এসো এবং সামান্য খাবার···
এখন টেবিলে পুরনো মোম জ্বলে—আলোগোছে যেরকম যায়
পাহাড়ি মায়ের পিঠে চর্মাধার, সেই খোল থেকে উঁকি দেয় শিশু
উঁকি দিয়ে দেখি আমি, প্রথম বিদেশী দাঁড়িয়ে উঠোনে
কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভিতু
আমার সে দুই চোখ কি দেখেনি প্রবল ঘৃণার সঙ্গে গুপ্ত আকাঙ্ক্ষায়?

আমার মতন স্বপ্নজীবী

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পৃথিবী তো খুব পুরোনো হয়ে গেছে, বিরক্তিকর, বাসি,
তোমার কাছে ; কোথাও আর আমার মতন স্বপ্নজীবীর দেখা
পাও না তুমি ; সহজ-জীবন-বিচ্ছুরিত আলোয়
মুখের বিভা নেই কোথাও,—এই ভেবে স্বকৃত গুহায় এসে
মুখ লুকোলে ; দেখলে না···রোদ শ্বেতকরবীর ডালে
জ্বলছে মহামহিম দিনের শেষ বেলাকার দীপ্ত প্রতিভাতে ;
কোথাও নেই শেষকথা, দিন আপন চিতায় পুড়ে
পরিশুদ্ধ দিনের জন্ম দেবে — এমন আশায় রাত্রি আনে ;
উন্মীলিত আকাশ জেগে প্রথম দিনের মতন ;
তোমার চোখের অস্বচ্ছ কাচ ভাঙো ।

তোমার চোখের স্বচ্ছ-জলের দিঘির কালো ছায়া
দেখবো বলে, আজ কেবলই ভিতর দরোজাটা
রেখেছি হাট করে ; দূরে খেজুরপাতার ছায়ার কারুকৃতি,
কাঠবেড়ালির কাটুমকুটুম, মাছরাঙাটার খুশির ওড়াউড়ি
দেখছি, সহজ লীলার এমন স্ফূর্ত ছবি
তোমার চোখের কাচে
বিম্বিত ;—এই পরম নয়, সামান্যকে জেনে
আমার যাওয়ার পথের ধারের গাছগাছালির শাখা
ঘন মায়ায় দুলতে থাকে । আমি কি খুব সুখী ?
তাও জানা নেই, শুধু তোমার জন্যে পথের কাঁটা
তুলতে গিয়ে জীবনকে খুব সহজভাবে দেখেছি···বিস্তৃত ।

মানুষ, তুমি কাঠবেড়ালির চাইতে কিছু অধিক স্বপ্নজীবী ।

অক্ষর

রমেন আচার্য

টেবিলে অদ্ভুত ছায়া নেমে এসে ছিঁড়ে ফেলছে একাগ্রতা
অক্ষরগুলিকে শেখাই শব্দের উচ্চতা ও গভীরতা মাপতে
দাম্পত্যজীবন সম্পর্কেও কিছু কিছু কথা হয়
বলি, চেষ্টা করে দেখো নিজেদের কথা নিজেরাই
প্রকাশ করতে পারো কিনা ।

ছায়া উঁকি দিয়ে যাচ্ছে । চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে
অচেনা অদ্ভুত ভীড় বাড়ছে চারপাশে । সোনামুখী সুচে
সুতো গলাতে যেভাবে সুচলো করতে হয় দৃষ্টি ও একাগ্রতা
সেভাবেই প্রতিটি শব্দের তল দেখতে চাই আমি
হ্যারিকেনের পলতে বাড়ানোর মতো করে উস্কে দিতে চাই
গোপন অগ্নিকণা
কলসীভর্তি গুপ্তধনের পাহারায় প্রাচীন বিষের সন্ধান করি ।

আমার শব্দবাহিনীর কেউ সশস্ত্র নয়, বরং ভীতু ও লাজুক
অন্তর্মুখী ও ফাঁকিবাজ ঃ আমি ওদের বোঝাই—
মনে রেখো শিশু বয়সেই তোমরা জিমনাশিয়ামে এসেছো
হাড় ও শরীরকে যে কোন দিকেই পারো বাঁকাতে
জেদি মেরুদণ্ডকে এভাবেই শিখিও শ্রদ্ধা ও বিনয়
খোলা তলোয়ারের কাছ থেকেও যেন তারা কিছু শেখে ।

কম্পোজিটারের মুখাপেক্ষী হয়ে কাঠের খোপে পড়ে আছো যে
সীসের অক্ষর, তোমার শরীরের ধাতব কাঠিন্য সত্ত্বেও মনে রেখো
এসব কথা । ছোবল মারার আগে যেন ঠিক ঠিক মনে থাকে
ডান ও বাম থলিতে রাখা বিষ ও অমৃতের কথা ।

একটা ব্যর্থ দিন

রত্নেশ্বর হাজরা

আজ সারাদিন কিচ্ছু হয়নি একটুও না
একটা কাজও সমস্ত দিন—
ঋতুর সঙ্গে দেখা হয়নি কথা হয়নি
ইতির কাছে বসা হয়নি মুখোমুখি
যে গেছে তার খবর নিতে যাওয়া হয়নি
যে ফিরেছে তার কাছেও
জানা হয়নি কেন ফিরল—তোমার কাছেই—
সমস্ত দিন এপার ওপার সাঁকোর কাছে
অনেক মানুষ
পুরনো আর ভাঙা সাঁকোয় কেবল মেরামতির আওয়াজ
একটা সাঁকোয় দু'পার জুড়ে দেবার ইচ্ছা
সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে আছ ঠায় দাঁড়িয়ে
কিন্তু সত্যি কিচ্ছু হয়নি—ঐ পারে আজ যাওয়া হয়নি
এই দিকে পথ ঐ দিকে পথ যেমন ছিল
তেমনি আছে সন্ধিপত্র কেউ লেখেনি—
সমস্ত দিন কিচ্ছু হয়নি কিচ্ছু হয় না
বলার মতো একটা কথাও বলা হয়নি বলা হয় না
তেমন কোনো জলের কাছে বসা হয়নি বসা হয় না
সমস্ত কাজ যেমন ছিল তেমনি আছে
শব্দপল্লী যেমন ছিল তেমনি আছে
খালের উপর জীর্ণ সেতু তেমনি আছে
হাওয়া বইছে—জল বয়ে যায়...

নষ্ট মাঠ আমি হরিদাসী

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

দুহাত ছড়িয়ে বসে আছি।
আমার ওপরে খাড়া বনস্পতি, নীচে ঝরাপাতা
ছিল, খাল পাশে
লোকেদের হাতে ঘুরত চারা, হাওয়ায় খুশির বীজ।
এখন তাহলে বলো, কেন
আমার ওপরে নাচে খড়কুটো ধুলো, শুকনো পথ?

সংস্কৃতির ধাঁধা নিয়ে আসাযাওয়া করে লোকজন
বাণিজ্য মানে না সীমা এপার ওপার
আমাকে বিদ্বেষ করে আসে যায় মলিন লণ্ঠন—
ওর সব প্রতীকতা পুড়ে গেল কীসের আগুনে?
'মাঠ হয়ে জন্মেছিলে, থাকো
তুমি কে হে হরিদাস বলো বাঁকা কথা?'
ধমকে দেয় নিভাঁজ সাফারি-তীক্ষ্ন একদা বিপ্লবী।

অন্দরে মহল নেই, শুধু গর্ত, বুঝি
জ্যোৎস্নার চাদর নেই, রাত জুড়ে গায়ে শুধু অপরাধবোধ
তাই রাগে। আমিও পাথর নই, তবু
আমার শনাক্ত পিঠে করকর ঘরঘর শব্দ হয়
মাথায় বালির বস্তা, লরিতে সিমেন্ট, প্রোমোটার।

আর কতদিন থাকি মেঘশূন্য, ইঁটের কামড়—
মাভূমি, তোমার মুখ স্বপ্নেও দেখি না কেন, বলো
মাটি কি উচ্ছেদ হয়, কেনা যায় ভূগর্ভের শাঁস
পৃথিবীর গায়ের বল্কল?

উত্তর থাকে তো দাও
নষ্ট মাঠ আমি হরিদাসী—পড়ে আছি দাঁত কামড়ে—
একদিন গাঝাড়া দিয়ে উল্টে দেব সব।

একমুঠো পৃথিবীর মাটি

দেবদাস আচার্য

আবার শুরু করার আগে সেই পুরোনো অ্যালবামটি সে হাতে নেয়,
স্মৃতি স্থির, দুঃখ-বেদনাও স্থির, সে তার ফাঁক-ফোকর খুঁজতে থাকে
ঐ অ্যালবামের ভিতর।

অসংখ্য ছিদ্র, অসংখ্য ভাঁজ ও ভুল ভ্রান্তিতে ভরা ছবিগুলি,
সে নিজেকেও ভালো করে চিনতে পারে না, আর তার বুকটা মুচড়ে ওঠে কষ্টে,
হ্যাঁ, ঐখানে পা রাখা ঠিক হয়নি, ঐ দিকের গর্তে লুকোনো ছিল সাপ,
ছবিগুলি নিরীহ, মৃদু, কিন্তু ছবিগুলির ভিতরকার ছবি সে
অনেক দেরীতে দেখেছে,
ভয়ঙ্কর তাদের রূপ, যা আপাত দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর বলে মনে হয়,
যখন দেখেছে, তখন তার আর করার কিছু ছিল না, ছিল শুধু দহন,
ভালো ও মন্দের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা সে জানত না,
দুঃখ ও সুখের কোনো চলমান পথকে সে চিহ্নিত করতে পারেনি
এই ব্যর্থতাই তাকে তীরবিদ্ধ করেছে,
তার দেহ নীল,
তার আত্মা রক্তাক্ত
বর্জন করতে করতে এখন সে শূন্য
এক মুঠো অন্ন, এক গণ্ডূষ জল
একটু পরিধেয় এবং বিশাল অনন্ত আকাশ
কোনো দর্শন কিংবা কোনো ব্যবহারিক জীবন-প্রণালীর ছক তার সামনে নেই,
বাইরে বিশাল জনসমাজের মুখর চলমানতা
ভিতরে আত্মার অনল
মাঝখানে তার অস্তিত্ব
কম্পমান,
এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে দিনপঞ্জি কোনো ব্যক্তির একার নয়
প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আছে
প্রতিটি মুহূর্তের ওপর বহু ব্যক্তি ও সমাজের নিঃশ্বাস ঝরে পড়ে
জীবনের সত্যিই কোনো স্বচ্ছতা নেই, নেই প্রাঞ্জলতাও
তথাপি এই জীবনের ওপরই সে আরোপ করেছে তার প্রেম ও মুগ্ধতা

তার বিশ্বাস ও একাগ্রতা
সততঃ ভঙ্গুর ও অন্তঃসারহীন জেনেও
সে দিনাতিপাতকে বিশ্বস্ত করে তুলতে চেয়েছে—
একদিন শান্ত হয়ে আসবে সব
একদিন সমগ্র জীবনটা একটা বিন্দু হয়ে যাবে
সে ভাবে
সেদিন সে হাতে তুলে নেবে একমুঠো পৃথিবীর মাটি
জীবনকে সাক্ষী রেখে সেই মাটি সে
উড়িয়ে দেবে বাতাসে।

বর্ণভাষা-২২

প্রভাত চৌধুরী

আমি দেখতে পাচ্ছি সবুজ বর্গক্ষেত্রে যে-কটি কৃষ্ণসার হরিণ ছিল
তারা চলে আসছে হলুদ বৃত্তে
আর হলুদ বৃত্তের জন্মান্ধ হরিয়ালগুলি চলে যাচ্ছে নীল রুম্বাসে
নীল রুম্বাসের বোবা সেলাই মেশিনটি কোথায় যাচ্ছে ?

আমি এই চলাচলগুলিকে দেখতে চাইছি
চলাচলের শব্দগুলিকে দেখতে চাইছি, গন্ধকেও।
এই চলাচলের পথেই ছড়িয়ে আছে তাম্রশাসন থেকে ফ্লপি-সভ্যতা,
নরসুন্দরের কাঁচি কিংবা সেই হাওয়াকল
ছড়িয়ে আছে জাতিস্মর খড়ম, পিতৃতান্ত্রিক জিমনাশিয়াম, আমার ক্রাচ।

সেই বৌদ্ধ পাখিটি এখন কোথায় ? সেই নিদ্রিত পেলমেট।

আসুন, আমরা যাত্রা করি সেই চলাচলের দিকে
আমাদের ক্যারাভানের সামনে যে পতাকাটি উড়বে
তার রঙ নিয়ে উৎকণ্ঠাটিকে আমরা এখানেই ফেলে রাখি।

চিরুটি
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

মানে খুঁজতে চাই না কোনও শব্দের।
যেমন, আমাদের এই গ্রামের নাম চিরুটি!
মানে থাকলেই বা কী! আমি জানতে চাই না।

এই গ্রামের পাশেই আর-একটা গ্রাম,
নাম বিলুমগঞ্জ···
দশ-ক্রোশ দূরে রেললাইন,
সারাদিনে দু-জোড়া ট্রেন আসে, যায়
স্টেশন যে নেই, তা নয়
নাম একটা থাকতেই হয়, তাই আছে—
সোনারন্দি!
ট্রেন এলে তখনই শুধু ঘুম ভাঙে সোনারন্দির···
বাকি সময় সাহাকাকাবাবু ও আমরা
দূর পাল্লার ট্রেনের শব্দ কানে নিয়ে
জেগে উঠি ও ঘুমিয়ে পড়ি,
বিলুমগঞ্জের নারাণবাবুরাও শুনি এভাবে বেঁচে আছেন
সোনারন্দির স্টেশনমাস্টার, তাঁর হাতে
শুধু লাল লণ্ঠন, সবুজ লণ্ঠন!
শুধু ডিশ-অ্যান্টেনাতেই ধরা পড়ে তাঁর ক্লান্ত সুখের ছবি।

নারী ও নক্ষত্র
কবিরুল ইসলাম

এসেছি অনেকদিন পরে
দুপুর তো উত্তীর্ণ কতকাল
আড়াআড়ি দীর্ঘ ছায়া পড়ে
নড়ে ওঠে কবির চৌতাল

আর কবিতার পরিভাষা
দর্শনের দৃষ্টান্তে ধ্রুপদী
নারী ও নক্ষত্র সর্বনাশা—
কে বলেছে? প্রবাহিত নদী

সরলরেখা কি কোনও উপমান
বরং সহস্র এবং একা
বাঁকে-বাঁকে অসম্ভব টান···
সতর্কীকরণ : 'সাবধান'

কে মেনেছে মুদ্রিত নিষেধ
রহস্যের ফাঁসে যে-চুম্বক
তাই আমার নিয়তি-নির্বেদ
ঈশপে আঙুরই শুধু টক

অনেক অনেকদিন পরে
তোমার-আমার স্বপ্নে-দেখা
এই ধারা আদি-অন্তহীন—

যে-নারী নক্ষত্র প্রতিদিন।

ইন্টারনেট

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

অন্তত যাবার আগে একবার পৃথিবী কাঁপাবো
রিমোট কনট্রোলে থাকবে শব্দের ব্রহ্মাস্ত্রগুলি
মেঘের আড়ালে ভ্রামণিক মেধাবী শূন্যের মত
প্রচারের মুখচ্ছবি ভেঙে পড়বে সমুদ্রের জলে

কামুর ক্যাসেল মনে পড়ে
লোভী ব্যারণের হাত একদিন শালীন হয়েছে
সেই শোভনতা যদি বৃষ্টি আনে ঘরের ভিতরে
যেন মেঘ স্নিগ্ধ দার্জিলিং-এ খুশি হবে

দুর্ঘটনা কবলিত প্রেসিডেন্সি কলেজের মেয়ে
তাকে ফেলে রেখে যারা নিজস্ব ধান্দায় চলে যায়
তাদের হৃদয় ফুটো করে আমার শব্দেরা
হা হা শব্দ করে
এখন কনট্রোল রুমে ইন্টারনেট পর্দায় চঞ্চল

অন্তত যাবার আগে একবার গোপন নির্জনে
আমি খুব দুঃসাহসী হব···

নিরুদ্দিষ্টের ঠিকানা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

হারিয়ে যাওয়ার সময় পরণে ছিল

দিগন্ত ট্রাউজারস্
উধাও শার্ট
ধুধু গেঞ্জি

গত শতাব্দীর শেষ রবিবার থেকে
তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না

ঠাণ্ডা প্রকৃতির সুস্থ মানুষ
ভারসাম্যহীন তার সংসারের আর পাঁচজন

এর সন্ধান জানাবার ঠিকানা
দিকচক্রবাল থেকেও আরেকটু দূরে
যেখানে সূর্যাস্তে হারিয়ে গেছে গুণে গুণে অসংখ্য মানুষ

এবং ফিরবে বলেও ফেরেনি

অদূরেই পৃথিবীর সীমা

তারাপদ আচার্য

১

আমার জোয়ারজল খুলে দিয়ে যাও
চোখে লাগে মুক্তিজল ধুয়ে যায় দিন মাস ফিরে আসে কণা
শিশিরে শিশিরে ঝরে সূর্যকণাগুলি

প্রবল তুফান লাগে, ঝরে যায় মেঘ-আলো-খরা
থাকে শুধু অগোচর শান্ত নদীখেয়া

আমিও তো অগোচর। তাপিত ললাট জুড়ে খেলা করে শীতরোদ
আনত শিরীষ ডাল মাটি ছুঁয়ে বলে যায় 'এ কোন নদীর খেয়া দিয়ে গেলে আজ!'
শ্রাবণের অন্ধকার নদীখেয়া বুকে নেবে এমন সাহস নেই কারো

চারপাশ ঘুরে ঘুরে এ নদী শরীর হয়ে যায়

২

আমাকে দিয়েছো এতো অগ্নিময় পুঞ্জমেঘে লাল
দুহাত ছাপিয়ে পড়া নিরিবিলি গোধূলি-সায়র!
নত মুখে বসে আছি, চারপাশ ঘেরা
অগণন গৃহামুখ ক্ষুভিত নিলয়

তীরভূমি ঝুঁকেপড়া ভাঙনের নদীরেখা জুড়ে
দেখে নিই জলাধার ভালোবাসা লুটোনো জোয়ার
পরিতাপ বুকে বাজে জ্বরতপ্ত ললাটসীমায়
লিখনে লিখনে গাঁথা ভাসমান ক্ষতচিহ্নগুলি।

৩

পটভূমি ভরে গেছে, নাগরিক দ্রোহকাল শেষ
সময় ফানুসওড়া, অতলের আকাশ-চাঁদোয়া
ছিঁড়ে যায়, দাঁড় ফ্যালে, নীলছায়া মায়াবী আতপ!

শূন্য কি ফোটায় রেখা? অবিরত নামহীন দ্রিমি
এসব দেখোনি কিছু? অন্যমুখে ফিরে আছ কেন?
অবহেলা মিশে থাকে, প্রত্যহ বিকীর্ণ করে জীবনের মহানিমডাল

অদূরেই পৃথিবীর সীমা!

মেঘাশ্রয়সপ্তক

অমিতাভ গুপ্ত

মহারঞ্জনে
ফুটে ওঠা বনে
প্রতি অরণ্যে প্রতিনির্জনে
উদ্বেল উচ্ছ্বাস

তারই ভাষায় কী প্রত্যাশায় চাওয়ার মতো
কিছু পাতা ঝরে অশ্রুর মতো কিছু-বা ইতস্তত
ছড়িয়ে রেখেছে পায়ে পায়ে কোন্ মিনতিপ্রতিমারত

২

সে' অশ্রুমতী
দিক্ অনুমতি
দিক্ ক্ষতক্ষতি
কিছু উপহারোপম

এ'ভাবেই যেন দিগ্বলয়ের মেঘাশ্রয় নিরুপম
এনেছে একটি গহনক্লান্ত তারার মতন শম
যাকে মনে হয় অন্তরালের রাত্রিচরমে পরম

৩

কৃতির মতন
যে-উচ্চারণ
চিত্রধ্বনিস্মরণ

মহাবজ্রের ঈশ্বরী হ'য়ে বিদ্যুতে কিছু বর্ণাভাসকে রেখে
কে যেন চলেছে পথ থেকে কোন্ পথান্তরাল এঁকে

৪

কে কোথায় যায়
কোন্ সজ্জায়
উৎসুক দীনতায়
দারিদ্র্য তাকে ঐশ্বর্যের মতো দিল অপরূপ
তার গোপনের অভিলাষটির মতো জেললে দিল ধূপ

৫

চলে যেতে যেতে

যাওয়ার খাতের

মতো একবার সমুদ্র থামে বিশবসময় থামে
একবার যেন অশ্রুর মতো দু'টি চোখে মেঘ নামে
একবার যেন দেখা হয় সব পূর্ণের পরিণামে

৬

প্রশ্ন এসেছে পরে

হয়তো মিতাক্ষরের

মতো বিদ্রোহ গ'ড়ে

তবু একদিন প্রত্যাশাহীন ক্লান্ত নিরুত্তরে
যদি অকরুণ পরাজিত মৃত স্মৃতিকেও মনে পড়ে
কোন্ গহনের কৌতূহলের মতো সে অনান্তরে
কিছু ফেলে যায় কিছু রেখে যায় কিছু ভরে কিছু ঝরে

৭

একটি উদ্বেগ

এবং সে' আবেগ

মুক্তির মতো রেখো

তারপর কোনো নির্মেঘ দিনে মহাকাশে চেয়ে দেখো

উত্তরবৃশ্চিকসূর্য

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

শীতকালেই আমি বুঝতে পারি কেন এ-দেশ একদিন
ব্রিটিশ কলোনী হয়েছিল।

মিনিবাসে ড্রাইভারের বাঁপাশের সীটে আমি বসে আছি,
কাছাকাছি ছাইরঙের আলো, কালচে মুক্তোর দীপ্তি
পাশে-বসা অবাঙালি যুবতীর চুলে একটু পড়ে আছে।
ও কিন্তু আমার মতো শীতকাতর নয়
প্রথম হিমবাতাস বইতেই কানমাথা ঢেকে নিয়েছিল,
আনস্মার্ট লাগবে ভেবে যা আমরা কখনো করিনি।—আমাদের
স্মার্ট থাকতে হয়।—কবে থেকে?—কেন, সেই স্কুলে-যাওয়া থেকে।
এছাড়া আর কিছুর সঙ্গে আমাদের অন্য তেমন কোনো
সম্বন্ধ থাকে না। তাই শীতে বেশি কষ্ট, বাইরে-ভিতরে শীত,
শুনেছি এমন শীতে কোনো কোনো লোক নাকি রাত্রির গঙ্গায়
সাঁতরে পারাপার করে⋯এরা বঙ্গসংস্কৃতির কেউ নয়।

এই স্যাঁতসেঁতে শীতে ফুরোবে না? পটলডাঙ্গার পথে
প্রৌঢ়া পথবাসিনীর হাতের রেডিও বেজে ওঠে
গীতা দত্তের গানে, ঐ সুরভরা দূর নীলিমায়, ঐ তারাঘেরা
স্বপনসীমায়, আর আচম্বিতে শীত চলে যায়। ফিরে আসে
কয়েক পা পর, যখন সে কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছে না।

পথে না বসলে, শীত কখনো যাবে না? এই শর্ত?
অথচ ভালই বোঝা যাচ্ছে যে পথ
বিদেশি গাড়ির জন্যে। হকার সরেছে। অন্য পথচারীদেরও
স্মার্ট থেকে, অন্য কোনোদিকে, সরে যেতে হবে দ্রুত।

কালচে মুক্তোর দীপ্তি, ছাইরঙের আলো
রাতের আকাশে পড়ে থাকে। পরদিন, জেগে
উঠে দেখি একই আভা পড়ে আছে রুগ্ণ সূর্যে, জমে-থাকা
হাল্কা, ভারি মেঘে⋯

যমজ

রণজিৎ দাশ

'প্রত্যেকের যমজ আছে দানবজগতে।'

—একটি ইজরায়েলি সিনেমায়
এক পাগলি চাপা স্বরে, বারবার,
নিষিদ্ধ সত্যের মতো এই প্রলাপ বকছিল।

'প্রত্যেকের যমজ আছে দানবজগতে।'

লাইট হাউস থেকে বেরিয়ে
রাত আটটার চৌরঙ্গির ভিতর
ঘুরপাক খেতে খেতে
হঠাৎ নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

স্পষ্ট মনে হল,
সিনেমাহল থেকে যে বেরিয়ে এসেছে,
যে এই আলোজটিল ভিড়ে
তুখোড় পকেটমারের মতো মিশে যাচ্ছে,

সে আমি নই, আমার যমজ।

ঘোড়া

শ্যামলকান্তি দাশ

কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এলোমেলো করে দিলাম রাত্রিবেলার পোশাক
তারপর মিলনতৃপ্ত মুখে ছিটিয়ে দিলাম দলা দলা থুতু
তারপর এমন জোরে দেওয়ালে গাল রগড়ে দিলাম
যেন বাক নিঃসরণের ক্ষমতা না থাকে—
ছিদ্রসরণি থেকে গলগল করে গড়িয়ে পড়তে লাগল রক্ত!
যৌবরাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে, জানি তুমি এইবার আর্তনাদ করে উঠবে
কিন্তু তার আগেই তোমার স্থির নিবন্ধ চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম কুশাঙ্কুর
কারণ এই সকৌতুক হরিণচক্ষু আমার একদম পছন্দ হয় না!
এর পর আর কোনো শাসন নয়—
উড়ন্ত কাক বকের চঞ্চু লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলাম তোমার অন্ন-ব্যঞ্জন
হাসতে হাসতে খুলতে লাগলাম একটির পর একটি জোড়, গ্রন্থি, ভাঁজ
ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেললাম বস্ত্র, উপবস্ত্র, যৌনজাল
একটু একটু করে খুবলে নিলাম পাপড়িকোমল সাদাসবুজ মাংস
তারপর তোমার তন্দ্রালু ডোরাকাটা মুখের ওপর দুলিয়ে দিলাম
একটি আধময়লা পৃথিবী
তুমি হাসলে না কাঁদলে না, পড়ে রইলে হতভম্ব, স্থির, স্পন্দহীন!

আর আমি?
প্রথমে উঠে দাঁড়ালাম রাজপুরুষের মতো সোজা, সটান
পর মুহূর্তেই আগুন ধোঁয়া আর কলঙ্কের ভেতর
মুক্ত বাতাসের মতো ছুটিয়ে দিলাম স্বাধীন, নিঃশঙ্ক
একখানা ঘোড়া!

গ্রামে, স্তব্ধ এক উন্মাদিনী

জয় গোস্বামী

মা বসে রয়েছেন জলকাদায়
মাথায় টুপটাপ টগর ফুল পড়ে
পাখিরা আসে, বসে, উড়েও যায়

বাঁশের মাচা বাঁধা, নৌকো এসে লাগে
ওদিকে ভোঁ বাজায় কাপড়কল
আজ তো হাটবার, সমানে পার হয়
মানুষ সাইকেল গরুবাছুর
লোকেরা থলে আর টিফিনক্যারি হাতে
খেয়ায় দুদ্দাড় ওঠে নামে
অদূরে ইঁটভাঁটা, কুলিকামিন, কাজ,
মাটিতে রাখা টেপ, হিন্দিগান
কেবল বটগাছ আস্তে পাতা ফ্যালে
কেবল রোদ এসে পা ছুঁয়ে যায়

মা বসে রয়েছেন জলকাদায়

রাত্রে ঘন ঘন বজ্র এসে পড়ে
দ্যাখে না কেউ, সব ভয়ে লুকোয়
ব্রহ্মতালু খোলে, বজ্র ধরে নেয়
জানে না কেউ, সব ঘুমে বিভোর

সকালে গাছেরাও বলে না কোনো কথা
নদীও একমনে স্রোত পাঠায়

স্তব্ধ শীত আসে, গ্রীষ্ম যায়…

মা বসে রয়েছেন জলকাদায়…

আরও রান্নাঘর

মৃদুল দাশগুপ্ত

গৃহ

ধরো, তা ব্যবস্থা হলো। অসম্ভব প্রাপ্তিযোগে এলো স্বস্তি
দুর্ঘটনা ছাড়া।
এদেশে নতুন এলে মনে হলো, তাও বৃথা বাক্যব্যয় হলোনা কোথাও।
প্রথমে স্নানের শব্দ, ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার ভাব এলো মনে।
সূর্যাস্তে বাতাস তবু শুধালো অবাক হয়ে,
এবার মাধবী ?

ফলে যা দাঁড়ালো তাতে ঠাণ্ডা হলো রান্নাবান্না।
ক্রুদ্ধ হতে হতে তুমি ঘুমোলে নিশ্চিন্তভাবে তাও।

ঘন্টা দুই পর
নিজে থেকে দরজা খুলে গেলো

মন

উদ্বেগে দর্পণে দেখে নিজেকে বান্ধবজ্ঞানে পরামর্শ ক'রে
অন্যত্র যাবার আগে যেন করস্পর্শ করি, আলিঙ্গনও ভাবি।
নচেৎ কী সহপাঠী! দোলাচল দ্বিধাদ্বন্দ্ব মেখে
স্ত্রীলোকের তালু থেকে ফুঁ-য়ে উড়ে বলি না কি, ও বন্ধু বাঁচাও ?
যখন আপৎকালে দিগন্ত অস্থির লাগে, অভিন্ন-হৃদয়ে—
তোমার পুস্তকে সখা, আমার করুণ রক্ত চলাচল করে।
তণ্ডুল বসিয়ে যাই দগ্ধপ্রায় অবেলায় স্নানে
বুদ্বুদে শৈবালে জলে ছিন্নভিন্ন যতো দেখি হু-হু করে মন

কমা আর সেমিকোলন

সুবোধ সরকার

কমা খুব ঝুঁকে কী যেন বলছিল সেমিকোলনকে।

কমা বলছে ঃ
আমার ভেতরটা এতো স্তব্ধ যে আমার খিদে পায় না
অসহায় অক্ষর ধরে ধরে আমি তোমার দিকে
এগোনোর চেষ্টা করি, সেমিকোলন।

সেমিকোলন বলছে ঃ
হিংস্র হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে ভোরের আলোয়
কী আছে আমার? শুধু একটা বিন্দু বেশি
বিন্দু দিয়ে কী হয়?
আমিও তোমার দিকে যেতে চেষ্টা করি
হতে পারে, ভালোবাসি হয়ত তোমাকে।

অন্ধকারে বৃষ্টি নামল। কমা আর সেমিকোলন জীবনে প্রথম
বৃষ্টিতে ভিজছে। যাদের জীবনে কোনো জল নেই
শুধু অক্ষর, অক্ষর
জ্ঞান ধরে রাখতে হয় বাঁদিকে, জ্ঞান ধরে রাখতে হয় ডানদিকে
বাঁদিক ডানদিক ভুলে এ ওকে জড়িয়ে ধরল
ঠিক তখনই দাঁড়ি এসে দাঁড়ালো সামনে।
সে কী লজ্জা! সেমিকোলনের বিন্দু ছিটকে গিয়ে আটকে গেল
দাঁড়ির তলায়। দাঁড়ি রূপান্তরিত হল বিস্ময়চিহ্নে।

বৃষ্টি থেমে গেছে, রাত একটায় তারা ফিরছে বাংলা ভাষায়
কমা কমার জায়গায়, স্তব্ধতায়
সেমিকোলন সেমিকোলনের দিকে যেতে গিয়ে ফিরে বলল ঃ
হয়তো একই লেখায়, বাক্যে বারবার দেখা হবে
আমাদের, তবু চিঠি দিও।

ঐশ্বর্য, তুমি ও আমি

তুষার চৌধুরী

মিনিট কাঁটার দিকে যেতে হবে এইবার, জন্মপল মৃত্যুবিপলের
অস্থির প্রদোষে একলা, যেখানে তোমার তীব্র নরম কোমর ঘুরছে
হে ঐশ্বর্য, ঐতিহ্যশালিনী
নাবিক পেয়েছে খুঁজে তুমুল দ্রাঘিমা এই দেশে
সমন্নবিপণি ঘিরে নীলিম নাভির নাচ, বারে রেস্তোরাঁয় ওরা খড়িহীন ঘোরে অশরীরী
ফেরি করে কেশরাগ, অধররঙ্গিমা আর মৃগমদমথিত সাবান
কোনো নায়কের নাম মাল্যবান নেই আর, মালা পচে গেছে
কচুরিপানার দহে শুধু কাটা হাত নয়, পড়ে আছে খোবলানো তলপেটও
পিরিচে খাবার বলতে ডিম ফাটা কুসুম দুই, দোফালা টমাটো
অনেক রঙিন আতা ফ'লে আছে পাঁচতারায় হলুদ সবুজ নীল লাল
জানি তুমি ভালোবাসো যা কিছু বৈড়াল
উজ্জ্বল মোসান্ড়া তুমি, দিনে নও, রাতের আগুনে স্বাহা হয়ে জ্বলে ওঠো
ঐশ্বর্যে, তোমার ঘুম পাশ ফেরে, তোমার তেলতেলে গালে লেপ্টানো কাজল
স্বপ্নে অগ্নিকান্ড দেখে কেঁদে ওঠো, সে আগুন নিবে গেছে ফায়ার ব্রিগেডে
গালে শুকিয়েও গেছে লোনা জল
ঐশ্বর্য, জীবন ভারি ছিঁচকাঁদুনে, আমি তাকে অযথাই অন্ধকার থেকে টেনে তুলি
মিথুনমন্দির সব ভেঙে গেছে, প'ড়ে আছে প্রত্নমুদ্রাশিলালেখগুলি
আমাকে এবার তবে যেতে হবে সিন্ধুতীরে নিরালায় হোটেল মারমেডে
যেখানে অপেক্ষা করছে জন্ম ও মৃত্যুর ঘড়ি, স্থলপদ্মের মতো সাদা
নির্জন বিছানা, রতিদাহ
ঐশ্বর্য, তুমি ও আমি মুহুর্মুহু গড়ে তুলব অপরূপ ভঙ্গুর কোণার্ক খাজুরাহো
তারপর হেঁটে যাব সন্তানের হাত ধ'রে, তারপর একা হব, ধুলোমাংস হব
তবু রেখে যাব কিছু ইতিকথা
ঐশ্বর্য, মরণশীল আমরা সকলেই, আর দ্যাখো চোখ না তুলেই
অধ্যাপক মেনে নেয় প্রক্সি-অমরতা
ঐশ্বর্য, অধরা তুমি, মনে হয় মনুষ্য না, পরজন্মে আমি হব
নির্জন মাঠের মুথাঘাস
আমাকে কি নেবে চিনে হরিণীরা, যাদের শুঁকেছি আমি মৃগমদ
চেখেও দেখেছি নোনা মাস?

আহত মানুষ

সৈয়দ কওসর জামাল

আহত মানুষ এক, পরিত্যক্ত, বসে থাকে নিজেই নিজের কাছে একা
শুঁয়োপোকা হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরে
কে তাকে আঘাত করে যদি না নিজেই কোন আত্মত্যাগে
জানায় সম্মতি

অস্ত্র এক উদ্ধত ভঙ্গিতে তার চারিদিকে ঘোরে
দ্বিখণ্ডিত হৃদয়স্তব্ধতা জেগে বসে থাকে কথার চারপাশে
শুকনো পাতার মতো খসখস খসখস শব্দে
লাফিয়ে বেড়ায় তার ছায়া
অযথা বাতাস এসে পশুর গলার স্বরে নাম ধরে ডাকে
ঘৃণা জাগে তার ধ্রুব—অমরতা এই !
কী করবে সে অমরতা নিয়ে যদি না জীবন
রেশমগুটির মতো ফাটে ?
অনুশোচনার কাছে গিয়ে বসে আছে নিষ্ঠুরতা
প্রেমভালোবাসাহীন শুধুই আকাঙ্ক্ষা বুকে রাত্রিদিন
অসহ্য হয়েছে

স্বপ্ন চেয়েছিল সে-ই, ঈশ্বরও একদা ছিল স্বপ্নের মতোই
আজ শুধু প্রমত্ততা, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ গাছেদের ক্রমাগত
মাথা নেড়ে চলা

এখনও গভীর ক্ষত চোখের ওপরে
আতঙ্কিত আহত মানুষ দ্যাখে—অন্য এক রহস্যজনক ক্ষত
ছড়িয়ে পড়েছে তার শেষ অহঙ্কারটুকু জুড়ে।

কুমারসম্ভব

বীতশোক ভট্টাচার্য

তার জন্য তুমি আজ সন্ধ্যায় অঞ্জলি বেঁধে দীপদানরতা ;
তার জন্য সেও আজ ভোর হলে বেঁধে দিল তুলসীর ঝারি ;
তার জন্য ভালোবাসা, ঘরের ভেতর ঘর, ধাঁধার মশারি ;
তুলসীর তলে আলো, তুলসীর মূলে নামা জলের বহতা ঃ
মন্দ-ঝিমানি জল ; মর্মরিত ও সফল দুজনের কথা।

গর্ভের ভেতর শিশু এই মাত্র শুরু করল কম্প্র নড়াচড়া ;
মাটির তলার ঘরে যখ-দেওয়া কার ধন, উত্তরাধিকার
মুদ্রায় সাব্যস্ত করে সকরুণ দায়ভাগ কিংবা মিতাক্ষরা ;
গায়ের ময়লা দিয়ে গড়ে-তোলা খেলার ও পুতুল তোমার ;
প্রেমের শরীর তার তোমার সর্বস্ব ক্রমে প্রাত্যহিকতার।

দ্যাখো সাড়া দেয় শিশু জীবনের সমর্থনে সানন্দ সংকেতে ;
রাত আর দিন ফেরে, ফিরে আসে দুজনের হারানো শৈশব।
চারণের চিত্রণের তক্ষণের কণ্ঠ চোখ হাত খুঁজে পেতে—
এখন হৃদয়ও পেলে। আরো যা সংরাগ থাকে দাম্পত্যের সব
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে দাও এই স্তব্ধতা, এ স্তব।

কেবলই গাহন করো, মনে হয় নতুন এ জীবনের ধারা।
দেখলে শালের কোঁড়া মনে পড়ে শিশুর খয়েরি ঐ গা।
কচি অশ্বত্থের পাতা ওর চুল ; ওঠে ধীর নদীজলে সাড়া
শান্ত শিশু শরীরের। তোমাদের দৈনন্দিন দিনরাত জাগা।
ঘুম স্বপ্ন তারই জন্য। আরো একা দুজনের নির্জন পাহারা।

উমা আর শঙ্করের যে আশ্চর্য তপশ্চর্যা, কুমারসম্ভব ঃ
বিয়ের মঙ্গলগান, দোলা-ঠেলা মৃদু গান—তোমার আপন।
আর ঘুমিয়ো না ছেলে, আসছে নিজস্ব গতিজাড্যের উৎসব।
কাঁদো, চোখ মেল, চাও, ও নবজাতক।
দ্বৈতে হয়েছিল যার সূত্রপাত, এ অদ্বৈতে তার সমাপন।

হৈমবতী তাঁর অঙ্গে মিশে ছিল অন্তরঙ্গ শিশুর হেমাভা।
শিবের স্ফটিক রং সুষমার বিচ্ছুরণ কেলাসিত আলো

ছেলের দু'চোখে জ্বলে। ফিরে এল ভোলানাথ ফের ছাইমাখা।
আকাশের তারা ওরা তোকে স্তন দিতে ওই নিচে নেমে এল।
স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের থেকে দূরে ঘুম যাও শিশু, মা এবং বাবা।

গ্রন্থ

অজয় নাগ

সর্বনাশা পোড়া চাঁদ ডাকে চুপে নিঃসাড়ে
দাঁড় করায় অগাধ খাড়াই খাদে
নিচে পলাতক জীবন

আমাদের অবুঝ ঘুম ভেদ করে
তামস মঞ্জরীর নিষিক্তকরণ
ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির মৃত্তিকায়

নিজেকে নিজের আয়নায় চিনতে পারি না
প্রতিদিনের হেঁটে যাওয়া রাস্তা অন্য

তোমার কি প্রাণে দয়া নেই
কীভাবে এই আভূমি গ্রন্থ রচনা কর কবি

বিমান থেকে

অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র

১

বিমান নামছে।
ঊর্ধ্বে, আকাশে, একরাশ তারা—
নিচে, মাটিতেও, একরাশ।
নিচেরগুলি ছোট তারা—নিবে যাবে তাড়াতাড়ি—
হয়ত কয়েক শতাব্দী পরেই, জ্বলবে না আর।
এই স্থান
অন্ধকার হয়ে যাবে।
উপরেরগুলি আরও কিছু বেশিদিন জ্বলবে নিশ্চয়ই।
কিন্তু, কী আসে যাবে তাতে?
একটি তারা যখন আমি,
মাটির বুকে, আকাশের বুকে স্থান পেয়েছি যখন,
কী আর ক্ষতি হবে তাতে,
বিমান যদি নামতে নামতে জ্বলে,
বিমান যদি জ্বলতে জ্বলতে নিবে যায়!

২

বিমানবন্দরে পেঁছোনোর রাস্তাগুলিও
উড়ানপথের মত।
যে পথ ধরে বিমানগুলি ছুটে যায়,
উড়ে যাবার আগে।
তেমনই ঋজু, প্রশস্ত, সমতল—
তেমনই জনবিরল।
উড়বার জন্যে প্রস্তুতি লাগে বিমানের,
বিমানে উঠবার জন্যেও প্রস্তুতি চাই তেমন।
এই পথগুলি ধরে ছুটে যাওয়া যাদের হল না কোনদিন,
আকাশও তাদের, বুকে টেনে নিল না কখনো।
আকাশ, আকাশ, প্রত্যাহার করো এই ছলনা—
তোমার প্রকৃত বক্ষ কোথায় রেখেছ, দেখাও—
আমি, এক ধরিত্রীপুত্র, প্রবেশ করব।

বাণরাজপুর

একরাম আলি

পথ সোজা ; দুদিকে বিশাল সব কুঞ্জ
দ্বীপভূমি—ডাইনে-বাঁয়ে আড়াআড়ি পথ
এত যে ছড়ানো রোদ, তার সামান্যই
গায়ে লাগে—বাদবাকি অনঘ, উদ্বৃত্ত

সারি সারি আম্লীবৃক্ষ, পাকা ফলে ভরা
দুপুরের ঝিম থেকে কেউ জেগে ওঠো
প্রথম পুনর্জীবন, প্রথম এ-হাঁটা
গাছভর্তি রে আলস্য, পাতা অবনত

বাঁদিকে ঘুরেছে—টানা উষ্ণ বনাঞ্চল
পুষ্করিণী, গাছপালা—সমস্ত কিছুর
আড়ালে যক্ষের গুপ্ত শক্তির প্রকাশ
আড়ালে প্রথম থেকে কেউ-বা দেখছে

আরশি ধরো, তাকে তার বিনাশ দেখাও
বলো যে প্রভুর দেহ ভক্ষিত হয়েছে
দেখতে চাইলে এই জল, প্রাচ্য পুষ্করিণী
নিজেকে উগরে দিয়ে উদর দেখাবে

দেখতে চাও ? দেখ, জলতলে পাথরের
কৃষ্ণমুখ—গুল্মে-ঢাকা দাঁতের শিলায়
পচা, গলা অন্ত্রের টুকরো লেগে আছে

দ্বীপভূমি—ডাইনে-বাঁয়ে নবতম পথ

শুরু হল অভিভূত মুখর বাজার
মাছের থেকেও বড়ো মাছ-কাটা বঁটি
ধারালো তোরণ—এসো মাছের ভিতরে
আঁশটে টাকা, রক্ত-মাখা খুচরো লাফায়
হৃৎপিণ্ডে লাফায় রক্ত—চাঁব, পিত্ত, নালি
বঁটি থেকে পিছলে যায় নিরয়-পাতালে

দ্বীপভূমি—সামনে তবু নব নব পথ
দুদিকে বিশাল সব কুঞ্জ, বনস্পতি

সব পথই পুরনো পথের অনুবৃত্তি
শুধু ভ্রম সংশোধন—যেমন আড়ালে
প্রথম দিনটি থেকে কেউ-বা হাঁটছে

বৃষ্টি

রমা ঘোষ

প্রথম গ্রীষ্মের শেষে আজ খুব বৃষ্টি এলো, এ সময়ে বলো
গৃহস্থালি কাজকর্ম টাকার হিসেব লেখা পরীক্ষার পড়া
কিছুতে কি মন বসে, বরং তোমাকে ভাবি, সেদিন ক্ষিধেয়
তোমার ভাগের ফ্রাই অর্ধেকের বেশি খেয়ে ফেলে
নিরর্থক কথা ফেঁদে জড়িয়ে ধরার মুখ্য তৎপরতায়
ছড়িয়ে দিয়েছি চিনি টেবিলে তোমার দিকে, অন্যে কি ভাবলো
তোয়াক্কা করার তত্ত্ব কোনোদিন খেয়াল থাকে না !
প্রথম সাক্ষাৎ সেই খুব মনে পড়ে,
জরিপের চোরা দৃষ্টি—এ কোন আকাট আর
অসহিষ্ণু রাগী,
তোমার সংশয় ছায়া বুঝেও তখন আমি নির্লজ্জ তৃষ্ণায়
ভাঁড়ারে মধুর খোঁজে আঘ্রাণ করেছি রূপ
আত্মঘাতে দ্বিধাহীন পতঙ্গ স্বভাবে !

নলখাগড়ার ঝোপ জলাভূমি অতঃপর গ্রাস করেছিল,
হরিণপ্রেক্ষণা তুমি হয়ত সে সব জানো,
ঘাসফুলে জলকণা দেখে
কেন যে তোমার জন্য হা হুতাশ হয়ত চাতক পাখি জানে,
তাহলে বৃষ্টির স্রোতে কী অবস্থা, অলকানগর নয়
এই খুব কাছের কলকাতায় তুমি
গলফগ্রীণ সরণির ভিজে সারা ছন্নতায় অনুমান কর ।

টর্চ জেবলে দেখি দয়ানদীতীর

অনুরাধা মহাপাত্র

নেভা ছাই থেকে দেখি ওই দয়ানদীতীর
ভাঙা সাঁকো দিয়ে যেতে হবে ওই জেলেদের বিধবা-গ্রাম
অন্ধকার নদী জানে মানুষের পিঠে আছে হাঙ্গরের কৌতুকলেখা
আমরা জানি না—
শুধু দেখা আর ভালোবাসার বোধে চলেছি সকল ফেলে
ভালোবাসা নেভা ছাই
ফের জ্বলে ওঠা ছাড়া কিছু নয়
তবুও থ্যাঁতা সাপ বুকে হেঁটে যেভাবে পেরোয় গ্রাম, লণ্ঠন, দিঘি
আলো যেভাবে পেরোয় আছড়ানো সমুদ্রের কালো ঢেউ
মোরগের কাটা চোখ থেকে যেভাবে বিধুর ধ্বনি
বহে যায় কলাপাতা থেকে নিচে রক্তরেখায়
নিজের শিশুকে জন্ম দিয়ে নিজের হাতে
গোর দিতে যায় যে মা
সেভাবে জ্বলন্ত সূর্যের দিকে গড়িয়ে যায়
অশান্ত মাথার তাম্রাভ বল
সেভাবে আমরা চলেছি
আকন্দফুলের কিছু অন্তহীন নীরবতা বয়ে
কোনো কোনো বীজ ফেটে পড়ে ঘূর্ণিতে
কালপুরুষের মতো মানুষের অবলুপ্ত অকিঞ্চন কান্না
সমবেত হরিণ ও হরিণীর নাচে জেগে ওঠে
যাকে বয়ে নিয়ে আসে বিদ্যাধরী হেনে শবরবিদ্যায়
যে জলে মানুষের মৃত ও জীবিত যুদ্ধের কিছু কাঁথা
ভোরের আকাশে মিশে গুন গুন করে ওঠে চৈত্রের ভ্রমরের গান
যে কাঁথা নবজাত হরিণের ঘ্রাণে হয়েছে মধুর
যে কাঁথায় বিদ্যাধরী থেকে নিঃশব্দ ফল্গুর অভিমান
লিখে গেছে আমাদের হাবাগোবা জেলেবুড়ো
বেজাত পটের কবি, খড়ের নৌকো বাওয়া
চেরা জিভ, আঁকাবাঁকা পর্বতমালার মতো পূর্বপুরুষেরা
নেভা শোক থেকে থেকে দেখি ওই দয়ানদীতীর

টর্চ জেবলে ওই নদী পেরোনো কি যাবে!
জেলেরা কি ধ্বংস করে দিতে পারে বিদেশী ট্রলার
সমুদ্রের তলদেশে গুপ্ত মেছো জালে
ধরা পড়ে যেতে পারে সাদা সন্ত্রাস!
টর্চ হাতে পেরোনো যাবে কি ওই নিত্যশোক জেলেদের গ্রাম
সারারাত টর্চ যেভাবে ঘুরে ঘুরে আলো ফ্যালে
সমুদ্র, জাহাজ, যুদ্ধ নাবিকের সঙ্গীতের জীবনের ডেকের ওপর—
ঘনকেশ নিশার আকাশে টর্চ ফেলে বোঝা যাবে
ঝাটিঙ্গা পাখিরা যায় অচেনা আগুনের দিকে!
টর্চ ফেলে বোঝা যাবে কেন ওই কলম্বাস
তাম্রভস্তন অরণ্যের আবিষ্কারে ত্রাস আর ধর্ষণের লীলা বহে দিয়েছিল
ঝরা পাতা, পোড়া গাছ, নীল গাভীর শিকারে!
দেয়ালে বার বার মাথা ঠুকে বোঝা যাবে
আমাদের দুজনের মাঝে অবিরাম কেন আছড়ায় বালুমাখা জল!
ওই প্রাণ, নির্জন যাচঞাহীন কলাপাতায় এঁকে রাখি
দিবারাত্রির কোনো স্তব্ধ আল্পনা
ছোট লণ্ঠনের ভেতর মিলনধ্বনি লিখে ছুঁড়ে দিই দূর জলে
নেভা টর্চ পুনরায় ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো নেমে
জলে ভাসা প্রসন্ন লাশের নিচে বিশাল তিমির মৃদু-গীতকম্পনে।

রজার পেনরোজের সি. কিউ. জি. তত্ত্বে যা বলা হয়েছে

সুব্রত সরকার

ভাঙা মূর্তির ভিতরেও প্রাণের কিছু কণা অবশিষ্ট থাকতে পারে।
ডাক দিলে সে হয়তো সাড়া দেয়, তার
অর্ধনিমীলিত চোখে এ জগত সম্পর্কে কিছু দুরূহ প্রশ্ন
রয়ে গেছে। অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ও আচ্ছন্নতা নিয়ে
এই বস্তুর মহাবিশ্বে তাই দাঁড়িয়ে থাকা, কারণ ইচ্ছে করলেও
হারিয়ে যাবার উপায় নেই, অতি সূক্ষ্ম
মানবিক চিন্তার অবয়বও মহাজাগতিক কণায় গড়া, তারা
কোথায় আর অদৃশ্য হবে!

বারোশো বছর আগে আমি ছিলাম কনকবর্মা, সম্রাট
দ্বিতীয় পুলকেশীর দক্ষিণহস্ত, কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে
ভাস্কর হেমন্ত মিশ্র আমার এ মূর্তি গড়েন। তাহলে আমি আসলে কে?
হেমন্ত না কনক? সব প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে না, শুধু
চন্দ্রকেতু গড়ে এই ভগ্নাবশেষের গবাক্ষ পথে সূর্যরশ্মি যখন চলাচল
করে—পাথরের শরীরেও সহসা উত্তেজনার
তাপ সৃষ্টি হয়, অন্যসময় কিছু নেই, মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে
দেখুন: পাথরের তরোয়ালের উপর
ক্রমে এগিয়ে চলা শৈবালের রঙ গাঢ় সবুজ হয়ে আসে।

এসবের ব্যাখ্যা কি? যেকোনো লেখা অনেক রকম সম্ভাবনা নিয়ে
আমাদের মনের নির্জ্জন স্তরে প্রবেশ করে বা বেরিয়ে
যায়, অনিশ্চয়তার দেশে তাদের কত রকম রূপ জানা সম্ভব না।
শুধু অনেক বিকল্পের মাঝে যে চিন্তার আকৃতি
এক গ্র্যাভিটন ভরে গিয়ে পৌঁছায় তারই প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ
বাস্তব হলো কল্পনার সেইটুকু যা আজ পর্যন্ত অজানা
কিছু শর্তসাপেক্ষে পুনর্লিখন মাত্র।

আবার বাস্তবকেও কখনও দেখা যায় কল্পনার জগতে ফিরে যেতে।
যেমন: প্রয়াত কবি অলকেশ ভট্টাচার্যের একটি চিঠি
খুঁজে পেয়ে আমার সেদিন মনে হলো—সে কি আসলে সকলের

এক মিলিত কল্পনা? অথচ কালী টেম্পল রোডের সেই
মেস থেকে লেখা এ চিরকুটের উপর এখনও প্রায় অন্ধকার এক কাক
ডাকছে, দুপুর, তবু নোনাধরা দেওয়াল বেয়ে খসখস শব্দে
নেমে আসা ইলেকট্রিকের আলোয় ফর্সা, লম্বা,
এক তরুণ, বন্ধুদের সদ্য প্রকাশিত কবিতা পত্রিকা পড়ছে।
বিহ্বলতায় তার আঁখি যেন একজোড়া বয়েল গাড়ির মতো, ধীরে
ভুট্টা ও জনারের ক্ষেতের পাশ দিয়ে অনির্দেশের পথে চলল।

হে অ্যালপাইন

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকাহীন তোমার কথা বলতে ভীষণ লজ্জা করে
পাহাড় ঢালে হে অ্যালপাইন অরণ্যানী মেঘগ্রস্ত
ঋতুোদর্শন কাব্যাকাব্য রেফারেন্সের ছলচাতুরি
সব ন্যাকামি এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে প্রকাশ হলে

পাহাড় ঢালে হে অ্যালপাইন অরণ্যানী মেঘসিক্ত
টুপটুপাটুপ জল ঝরাচ্ছে একেক ফোঁটা পরাণদায়ী
লোহিতকণা আসছে নেমে নল বেয়ে ঠিক ধমনীশিরায়
এবং বেঁচে উঠছে ঢ্যামনা বুদ্ধিবাতিক ঘাটের মড়া

এবং খুশবু? ঠিক যেন বা জ্ঞান ফেরানো গন্ধলবণ
হাপিস্ স্মৃতি ফেরৎ পাচ্ছে নগরবেহুঁশ ধান্দাজ্ঞানী
পায়ের তলায় ভিজে পাতার স্তূপীকৃত নরম জাজিম
আরো তলায় সফেদ প্রান্ত মরকতনীল স্রোতনৃত্য

ভূমিকাহীন তোমার কথা বলব বলে তৈরী হচ্ছি
পাহাড় জুড়ে হে অ্যালপাইন ঘোরবনানী মেঘোন্মত্ত

তালসারি, ভাদ্র ১৪০২

অরুণি বসু

পান্থনিবাস থেকে বেরিয়ে নদীর কাছে আসি।
এপাশে জেলেদের আঁশটে গ্রাম, ওপাশে নদী পেরোলে সমুদ্র।
জেলেরা মাছ নিয়ে ফিরেছে ডাঙ্গায়,
ভাগ বাঁটোয়ারা চলছে।
মদের চাট তৈরি করবে বলে কষে পিঁয়াজ কষছে ভুজঙ্গ,
তার ঝাঁঝ এসে লাগছে নাকে।
অন্ধকার মায়া ছড়াতে ছড়াতে অধিকার করে নিচ্ছে চরাচর,
তার ঝাঁঝ এসে লাগছে শরীরে।
চায়ের দোকানের বাঁশের বেঞ্চিতে বসে থাকি চুপচাপ—
হাওয়া নয়, সোঁ সোঁ করে জ্বলতে থাকে পাম্প-স্টোভ।

ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের অন্ধকার পান্থনিবাসকে দেখি,
সব কিছু প্রতীক বলে মনে হয়, নিজেকেও।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মদ

গৌতম চৌধুরী

তুমি তো তরল নও, তবু দেখি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মদ তুমি
যত পান করি তত অগ্নিভারে দাউ দাউ জ্বলে ওঠে স্নায়ু
শ্বেতাশ্ব ছুটেছে তীব্র মেঘে মেঘে আমি তার নির্মম সওয়ার
অস্ত্রের ঝিলিকে ভেঙে টুকরো হয়ে ঝরে যায় বধির আকাশ

কোন্ যুদ্ধে যেতে হবে বলো তবে, মর্মরিত রক্তের নিশান
হাওয়ায় দুলেছে আর অন্তহীন মেরুদাঁড়া হয়েছে মাস্তুল
ভেসেছে নাবিক, ঘোর ঊর্মির রহস্যে ঢাকা দ্বীপান্তর তুমি
লবণের ঘন গন্ধে রাত্রি-ফসফরাসে হাসে মায়াবী দু'চোখ

নিজে এসো নাস্তাপানি, আজ আমি হলায়ুধ অদম্য কৃষাণ
অশ্রুতে করেছি নম্র এঁটেলের বজ্রটান ধূলিস্নানে মজে
এবার ছড়াব বীজ কীর্তনের বাউলের, আউলা হয়ে নাচে
মেতে উঠব, তালে তালে শিস দেবে এ-বাংলার রঙ্গিলা পাখিরা

ছায়াকে বললুম

ব্রত চক্রবর্তী

ছায়াকে বললুম, আমি বড় হলে
তুমিও তো তাই।
আমি কুঁকড়ে দুমড়ে গেলে
তুমিও তো ম্লান।
অভিমান কোরো না, বললুম
পিছু পিছু এসো।
ছায়া সেই আসে, আর
চাপা রাগ-অভিমানে গরগর :
তুমি আমাকে পাশে নিলে না
কক্‌খনো, সেই পিছু পিছু!
তোমাকেই দেখা যায়, চেনে
লোক, নদী অরণ্যানী, সমুদ্র পাহাড়,
মেঘ, জ্যোৎস্না, যেহেতু সামনে।
আমি পিছু পিছু, দ্বিতীয় মলাটে
মুখ ঘষি, পিঠ, কেটে-ছড়ে যাই।
এবার দাঁড়াতে হয় ঘুরে, বলি ছায়া
কাঁটা ও পাথরগুলি, বর্শাগুলি,
কষায় শুভেচ্ছাগুলি, আড়চোখ কটাক্ষগুলি
আমি যে প্রথমে নিই, সহ্য করি,
কখনও দেখো নি?

মা

কৃষ্ণা বসু

প্রাচীনা হয়েছ আজ।
মুখে কত কারুকাজ, সময়ের সাহসের দাগ।
খানাখন্দে ভরা জীবনের চোরা গর্তগুলি ক্রমে
ছায়া ফেলে বর্ষীয়সী মুখের ওপর।

একদিন ঐ মুখে উঠত ফুটে জ্যোৎস্না অপার।
একদিন ঐ মুখ-ই প্রিয় পরমান্ন ছিল ক্ষুধার সুঘ্রাণে,
চুমু খেয়ে, দুহাতে জড়িয়ে কিছুতেই মিটত না সাধ;
উপর বাহুর গন্ধ, পিঠ ঘেঁষে ছোট লাল তিল,
কত প্রিয় ছিল এইসব!
আজ সুপ্রাচীন মহানিম গাছের মতন চুপ,
আজ আর কেউ নেই গাছের তলায়,
পাকা, ঠাণ্ডা নিমফল পড়ে আছে শীতল ছায়ায়…

সন্তপ্ত জীবন থেকে ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে দুদণ্ড জুড়োই।

ছিন্নবিলাস

প্রশান্ত রায়

আছে, কেউ কেউ আছে আমারই মতো দূরে
দাঁড়িয়ে থাকছে। কেন যে দূরেই থাকতে চায়
দূরেই রাখতে চায়, জোড়াতালির সময়
বড়ই হতাশ বিস্ময়

ভুলে যেতে চাই সব টা-টা বলে
রুমাল ওড়াই যত ততই ঘনত্ব
বাড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে নাড়ায় এত
গভীরতা ও ওদের ঘনত্ব

অন্তঃমুখর ছায়া মুছে ফেলতে গিয়ে
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে

উত্তর-আধুনিক

উজ্জ্বল সিংহ

এক-পৃষ্ঠা বালিয়াড়ি যোলো-পঙ্‌ক্তি জল
সকালের অন্ত্যমিলে বায়ু ছলোচ্ছল
কুয়াশার কালি দিয়ে লিখলাম চিঠি
সহসা মিলিয়ে গেল প্রেমের রাত্রিটি।

ভেতরে কঞ্চুলী নেই লাল-পূর্বদিক
চতুর্দিক আলুথালু শরীরে ঝিলিক
শিহরনে আকাশের নীল-অনুপ্রাস
মেঘের কলমে ঢুকে হল দীর্ঘশ্বাস।

"কেবল অসভ্য কথা! চিঠি বলে একে?"
রেশমি রোদ বলে উঠল গিরিচূড়া থেকে।

কতদিন কতরাত্রি কত কষ্ট করে
ফোটালাম সূচিশিল্প পাতা ও পাথরে
সব ব্যর্থ সব ভস্ম সব গেল জলে
সাদা পৃষ্ঠা উড়ে গেল চাঁদের আঁচলে।

সাদা ঘুম সাদা পৃষ্ঠা যারে উড়ে যারে
ডানা মেলে সেলুলারে উড়ে যা পেজারে।

আমার শিশুর পথ

সুজিত সরকার

প্রেমিক ছিলাম একদিন
আজ পিতা

আজ জানি
কাদের বাড়িতে থাকে সারস, ময়ূর
কাদের বাড়িতে খরগোস

আজ
শিকারী পাখির ক্ষিপ্রতায়
মাটি থেকে তুলে নিই
পেরেক অথবা আলপিন

আমার শিশুর পথ যেন নিষ্কন্টক হয়

ওই পথ দিয়ে যেতে যেতে
লক্ষ্য করি আরো কত শিশু
ওরা জানতে চায় না
একে অপরের নাম অথবা ঠিকানা

ওদের নিষ্পাপ চোখে সবাই সুন্দর

ওরা কত সহজেই
একে অপরের বন্ধু হয়ে যায়!

অজস্রবার

প্রমোদ বসু

যাবার পরও এমনি দিন, এই তো ভোর, এই তো গাছ,
শিশির-পথ,
সন্ধ্যারাগে সূর্য যায়।
যাবার পরও এমনি ঠিক ঝঞ্ঝা-ঝড়, বৃষ্টিবান, মিছিল, ভিড়,
জীবনযাপন, মৃত্যুহার।
একটি শুধু শান্ত মুখ, তৃষ্ণাহীন, ভরসাহীন, তোমার মুখ,—
অশ্রু আসে প্রতীক্ষায়।
একটি শুধু আর্ত বুক, পাগলপ্রায়, নিরুত্তাপ, সঙ্গ চায়;
রাত্রি জুড়ে অন্ধকার!

যাবার পরে অনেকদিন শূন্যে-ওড়া স্মৃতিপালক, মৃতপালক,
পলকহীন উর্ধ্বাকাশ
হৃদয়বাহী বন্ধ গান, সঙ্গভয়, স্বপ্নহীন, নিদ্রাহীন
রাত্রিময় রাত্রি হয়।
বাইরে সব হুবহু সেই আগের মতো, শূন্যতাও দৃশ্যহীন,
ভিতরে ধু ধু মরুভূমির
বালির ঝড়, ঠিকানাহীন পথের দূর, কোথাও নেই মরূদ্যান,—
মৃতের স্মৃতি বিপুল ভার!

তবুও জানি, তুমি আমার, একা আমার, যদিও হও অন্য
কারও;
তোমার কাছে স্মৃতিরঙিন পালকটুকু ভরসা পায়,—
বাঁচতে পারি অজস্রবার!
দৃশ্যহীন অন্ধকারেও অজস্রবার, অজস্রবার।

ঠোঙা

সুব্রত রুদ্র

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে দেখি, ফুটপাতের ধারে হাঁটে একটু একটু মুচড়োনো ঠোঙা
তবে ফুটপাত থেকে বেরোয় না।
প্রথমে আমার সঙ্গে চোখাচোখি করেনি তারপর চোখে
চোখ পড়তে শুয়ে রইলো উপুড় হয়ে।
ঠোঙার পায়ের কাছে ইংরেজিতে তোমার নাম লেখা
এত অস্পষ্ট যে বোঝাই যায় না। রাস্তায় যারা যাচ্ছে,
কেউ দ্যাখেনি নামটা?
সামনের গলিতে ক্রিকেট খেলছে ছেলেরা, তারা
ভ্রুক্ষেপ করলো না। আমি দেখছি তোমার নাম পড়ে আছে ধুলোয়,
কোথায় রাখবো এক্ষুণি? কেউ দেখে ফেলবে রাস্তায় গড়াচ্ছো তুমি।
তোমার লাগছে, কী করি? চল ভিতরে,
বাইরে কত লোক অপেক্ষা করছে, বাইরে ধুলোর গন্ধে
শুয়ে পড়লে?

দলা পাকিয়ে মুখে পুরে গিলে ফেললাম আমি।

দেবদূত দেবদূতি

নির্মল হালদার

১.
দেবদূতকে বলেছিলাম, একটা নারকেল নাড়ু দেবো
ধরে রাখতে পারবে আজীবন
দেবদূত হাসতে হাসতে আমাকে দেখিয়ে দেয়, পেতলের এক গোপাল
যে একটি নাড়ু নিয়ে একই ভাবে কাটিয়ে যায়
ক্ষুধাতৃষ্ণার আলোঅন্ধকার

আমি কাকে ধরে রাখতে পারি চিরকাল, কাকে,
আমার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে চলে গেছে দেবদূত

২.
মুখ ঢেকেছে দেবদূতি
দেবদূত হাসছে
দুহাতে মুখ ঢেকেছে দেবদূতি, সে নগ্ন।
নগ্ন এক নারী।
চরাচর স্তব্ধ, আর আমি
পাখি হ'য়ে দেখছি সৌন্দর্যের বিস্তার

৩.
সন্ধ্যা নেমে এলো আমার কাছে
আমি তাকে দিতে পারিনি আমার ডানা
আমি কি দিতে পারবো আমার বিষণ্ণতা

জলের ক্ষয় নেই জলের তৃষ্ণা নেই
জলের কাছেই রেখে আসবো আমার সন্ধ্যা

জল থেকেই উঠে আসবে রাত্রি

তারপর একদিন

সোমক দাস

তারপর একদিন সূর্যের সঙ্গে এক অধিকতর সূর্যের সঙ্গম হলো
যেহেতু সঙ্গম শুধু অধিকতর শক্তির সঙ্গেই হতে পারে
দুর্বলের সঙ্গে যা হয় তার নাম দয়া বা করুণা বা মায়া বা ছলনা
এসব শব্দগুলো অবশ্য পুরনো, আধুনিক কবিরা আর ব্যবহার করে না
বিভিন্ন জটিল শব্দবন্ধ নির্মাণ করে তারা এককত্ব প্রত্যাশার স্বরে
যেহেতু জানে না
আগামী প্রজন্ম শুধু ফিক করে হেসে ফেলবে এইসব মহাকবি কমপ্লেক্সে ভুগে ভুগে
সরু হয়ে যাওয়া সব স্মার্ট পদ্যাকারদের লেখা পড়ে
যেহেতু সঙ্গম শুধু অধিকতর শক্তির সঙ্গেই হতে পারে
একদিন যদি জানা যায়
বিবর্তনবাদ আসলে খুব ভুল কিংবা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব
প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল পুনর্মূল্যায়ন সাপেক্ষ
কিংবা যদি জানা যায় গ্যালিলিও আবার জন্মেছেন ইত্যাদি
কবিতার সংজ্ঞাও হয়তো নতুন করে লেখা হবে
মহাপুরুষদের নিয়ে নতুনতর ভঙ্গিতে হাসাহাসি হলেও হতে পারে
ব্যবসায়ীরা তবু আবিষ্কার করে যাবে বিভিন্ন ভেজালশিল্প
মহিলা ও কবিদের মধ্যে তবু জেগে থাকবে ঈর্ষা
আমি আরও বড়
হয়তো তখনই এক অধিকতর সূর্যের ভঙ্গিতে
সবাইকে সঙ্গমে ডাকবে এই যৌনজন্ম
তার অপার্থিব মায়া নিয়ে, অর্থবহ
অর্থহীনতা নিয়ে, হয়তো
তারপর, একদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে আবার, হয়তো
জানা যাবে তুমি কে, আমিই বা কি, কে বেশি শক্তিমান..
প্রকৃত সঙ্গম হবে তারপর, হয়তো একদিন।

দারুদেবতা

সুধীর দত্ত

উদ্যত ক্ষুর হাতে পালকিতে লাফিয়ে ওঠেন মায়াপুরোহিত।
কেটে নেন দেবীর কেশগুচ্ছ।
মাথায় মুকুট গলায় শতনরী বাহুমূলে শস্যদানার তাগা এবং চন্দ্রচূড়
দেবী চলেছেন গর্ভগৃহের দিকে।
কাঁপাকাঁপা লণ্ঠনের আলোয় ঠাকুরমার দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে নামে।
কথিত আছে
দেবীচক্ষু থেকেই নির্গত হয়েছিলো এইসকল প্রস্রবণ ও ঝর্ণা আর
ছিন্নভিন্ন দেহ দিয়ে তৈরী হয়েছিলো আকাশ আর মাটি।
এইসব আদিম খোঁদলের ভেতর পাক খেতে খেতে
খোকন একটি পিঙ্গলবর্ণের আশ্চর্য পাখি হয়ে ওঠে।
তার বিপুল ডানার অন্ধকারে
ঝটপট করতে থাকে আজটেক নগরের সেই দারুদেবতা ও দেবীমুণ্ড

একবাটি জলে সমুদ্র

বাপী সমাদ্দার

আমি স্বপ্ন দেখি ডানাওলা বাড়ি, মেঘ
ফুঁড়ে যেন জটাকুট পিঙ্গল ঈগল স্রোতস্বিনী।
আমার ভাসন্ত বাড়ি সাকিন তালুক পরচা নেই,
চবুতরায় ক্যাকটাসের কান্না নেই, ঘাসজমি চেঁচায় না,
কালকাসুন্দ-র ডালে সাদা বকের কল্পনা : বাড়ি।

হাড়ের হাপুন তুমি ছুঁড়ে মার শীতের সন্ন্যাসী ;
বুনোকাঁটা লতাপাতা ছিল অভিন্নহৃদয় ফেট্টি।
গাছের বাঁকানো প্রান্তে ছিলা তাতে আগুনের তীর
এই হল ধনুক আমার — তবু মিশকালো অতল সুন্দরী
সমুদ্রের ওপরে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত অক্টোপাস।

শ্যামা, সমুদ্রের নিচে শান্ত রাবারনুড়ি বললেই
সব বলা হয় না; এই যে পাথুরে অস্ত্র আর ঐ ফলন্ত গাছ,
বস্তুতে বস্তুতে ফুলকি আর নৃত্যপর ঝরনা — শ্যামা,
বলতে পার কোথায় তোমার কড়িসাদা কুয়াশার মুখ ?
চিঠিতে যা লিখেছো তা সমুদ্রকে সীমায়িত করে একবাটি জলে —
একবাটি জল জানলে পৃথিবীর তিনভাগ জল জানা হয় ;

ভুল, ঠিক, অর্থ, অনর্থ — পারি না, আমি পারি না !

শস্যগান

বিশ্বনাথ গরাই

১.

উত্তীর্ণ মণীষা, এই রাঢ় বঙ্গদেশ ; সারি সারি
ধানশিশু, স্ফুট ক্রীড়াভূমি। এখানে হাওয়ার গন্ধ
তীব্র হৈমন্তিক, এখানে পদক্ষেপ মেনি ভাটিয়ালি ;
ঐ যায় রূপসাগর, একা শুভ্র মেঘ ; ঐ যায়
সরু পথ, কাশের গহনে ; দিগন্ত তখন খুব এত সন্নিকট
হাত বাড়ালেই স্পর্শ, প্রিয় গ্রন্থপাঠ ;

শস্যানত বাংলাদেশ, সে-ও এক মহাগ্রন্থ ; আদিম কৃষক, আমি
পড়ি, আর পড়ি — আলপথে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকেও
সেই পাঠ অসমাপ্ত রেখে উঠে আসি !

২.

লাল বল গড়িয়ে পড়ল
আমার উঠোন থেকে ধানখেতে, তারপর লাফাতে লাফাতে
সেই বল বৃত্তাকারে ফিরে এল, পুনর্বার,
আমার শিশুর হাতে ;

তখনো বলের গায়ে ধানের সুবর্ণগন্ধ স্পষ্ট লেগে ছিল ;
নিজহাতে সেই গন্ধ লেপে দিই অনাবৃত দেহে তার — দেখি
আমার সন্তান, রূপান্তরিতের ধর্মে, লক্ষ লক্ষ ধানগাছ হয়ে
আমার উঠোন জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে !

চাঁদ ও স্বৈরিণী

গৌতম ঘোষদস্তিদার

যেন অখণ্ড কাচের উপর দিয়ে তুমি
হেঁটে যাও জাদুবালিকার মতো
আর মধ্যরাত তোমাকে হাতছানি দ্যায়
ভুল বাতাসের দিকে
পলকে উড়ে যাও তুমি স্মৃতিহীন
ছেঁড়াকাগজের মতো
বাতাসে ভেসে যায় তোমার অনুকম্পাগুলি
স্তব্ধরাত তোমাকে কোলে তুলে নেয়
আশ্লেষে চুম্বন করে পথপাশে, সরাইখানায়
থুতু ও লালায় ভিজে যায়
তোমার অধরোষ্ঠ, প্রতিশ্রুতি !

রাত বাড়ে, জ্যোৎস্নায় প্রকাশিত হয়
তোমার দুটি নীরব জানলা
সেই অবকাশে মধ্যরাত নির্নিমেষে
আরও-কিছু ঝুঁকে আসে তোমার উপর
অবর্ণনীয় দুঃখের কথা বলে
তুমি তাকে স্নেহ দাও, মায়া দাও
দয়াপরবশ শরীর জেবলে দাও তাকে
আর আঁচল সরিয়ে সে তোমাকে অপচয় করে
হাওয়া ঘুরে যায় !
ব্রিজের শিয়রে খিন্ন চাঁদ তখনও রাত জাগে
অপলক চেয়ে দ্যাখে তোমার মহিমা
তারপর চুল ও আঁচল গুছিয়ে
তুমি যখন তীরে উঠে আসো
ছিন্নভিন্ন সে তখন তোমাকেই
কামনা করে, মেঘের আড়ালে যায় !

মিমির ক্যালকুলেটর

পার্থপ্রিয় বসু

মিমি তো সরল মেয়ে, একটু হলুদ,
ক্যালকুলেটরে ধূসর সংখ্যা এলে
বিয়োগচিহ্ন এলে অমনি অস্থির হয়ে পড়ে।

সহগের ভেতর নীল ভগ্নাংশ
সমানচিহ্ন মুছে দেয়।
গাঢ় দশমিক ডুবো সূর্যের মতো
অন্ধকার ছড়ায় দুপাশে।

তেরোটা সংখ্যা মনিটরে ঢোকার জন্যে কি হুড়োহুড়ি!
দশঘরা বাক্সের ভেতর আবছা সন্ধেবেলা মিমি
কাকে কাকে বাদ দেবে ভাবে।

রাত হয়। ছাইরঙা আয়ত দুচোখে
কাজলের সরু দাগ তারাদের সংখ্যাতত্ত্বে
গভীর বিশ্বাস এনে দেয়,
সংখ্যা-জন্মের কথা মনে পড়ে তার।
২, ৩, ৫, ৯ মিমির অলীক ভাইবোন
জড়ামড়ি করে শুয়ে লাল কেঁচোদের মতো
অচেতন ঘুমে ডুবে যায়।

শেষরাতে দশটি শূন্যমুখী তারা
পৃথিবীর সময়চিহ্নে এসে স্থির হতে থাকে।
দিকচক্রে তিনটে জগৎ তিন দিকে ভেঙে যাবে ভাবে!

বীজ
সঞ্জীব প্রামানিক

প্রলয়ের আগে আমি অন্ধ ছেলের হাত ধ'রে পৃথিবী ছেড়েছি ।
ছিলাম বাতাসে, শূন্যে, আমার ইচ্ছা নিয়ে অতিকষ্টে
মেঘেদের কাছাকাছি, বাতাসের উপরে উপরে । যাতে কোনো
ক্ষুধার্ত পাখির চঞ্চু ঠুকরে না দেয় চোখ, ফল ভেবে ।
ছিলাম তোদের জন্য মানুষেরা — তোদের রন্ধনশালা, তোদের সন্তান
সকলের কথা ভেবে, এক অন্ধ প্রাণ দিয়ে যেন শত সূর্য, শত চক্ষুষ্মানে
ভ'রে দেব পৃথিবীকে । ছিলাম মেঘের কাছে
ধোঁয়া, বাষ্প, জলকণা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে । মুনি-ঋষিদের মতো
ধ্যানে, জ্ঞানে, কোটি কোটি কায়াপথ পেরিয়ে পেরিয়ে
আমার ইচ্ছা আর আমার সন্তান ।

শূন্যে ঘোর অন্ধকার । লক্ষ অমা ঘোর ক'রে মেঘে মেঘে
দশদিকে ঘুম । চারপাশে জল
আমার ইচ্ছার চোখে বৈবস্বত শুয়েলেন তাকে ।
প্রথমে জাগল মাটি, যা আমার পিঠ —
দেখ, দেখ মেরুদণ্ডে হল-কর্ষণের দাগ লেগে ।

বীজ, তুমিই পাখির ডানা ; শূন্যে উঠে নীলিমাকে ছুঁয়ে
মাটিতে নেমেছ । তোমার, তোমার গর্ভে
উল্লাস করেছে জল, বাতাসের অমিত করুণা ।
আর ধীরে, খুব ধীরে জেগেছে নিশ্চয়-মাটি, প্রথম ওঙ্কার
বিদ্যুতে-বিদ্যুতে ক্ষুধার্তের দাঁতের ঝিলিক ।
অন্ধ ছেলের হাত ধ'রে প্রলয়ের আগে আমি পৃথিবী ছেড়েছি
যাতে প্রলয়ের পর আবার, আবার পৃথিবী দেখি ।

আজ শস্যক্ষেতে ভরে ওঠে আমার পৃথিবী যাতে কণ্ট না পায় মানুষ —
এই ভেবে যত অশ্রু রেখেছি লবণ-দ্বীপে
যাতে মানুষেরা নুনে-ভাতে বেঁচে থাকে

আজ যত ধোঁয়ার নিশানা ওড়ে ইউরোপে, ইউরোপে
যত পেতে রাখা রেলপথ, শূন্যে জেট, যত স্থল-যান
আমার নিঃশ্বাস নিয়ে ছুটে যায় ।

দেখি, একটি বীজের মধ্যে ক্ষুধা ও সুন্দর
পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়েছে । প্রলয় আসুক, বাপ হারানিধি—
আমি তোর প্রথম পালক — মেঘ, বাষ্প, ধোঁয়াদল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
প্রলয়ের পর পর পৃথিবীতে পেঁছে যাব, আর দেখব
গাঁ-গঞ্জ আলো ক'রে বিস্ময় চিহ্নের মত জেগে আছে কচি-কাঁচা
লক্ষ লক্ষ অভুক্ত সন্তান ; থালা হাতে, উনুনের পাশে —
ভাত ও আত্মার গন্ধে মিলে মিশে
পুনরায় জেগে উঠবে বলে ।

বটানি বা বন্ধুত্বের সংজ্ঞা
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

করমর্দনের পর নিচু হয়ে সম্মান জানাই—
শৈশবে গাছের কাছে এই রীতি কিছুটা শিখেছি ।
বটানি ও পুরাতত্ত্ব নেড়েচেড়ে এটুকু বুঝেছি
চলচ্ছক্তিহীন গাছ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিপরীত আচরণ করে ।
পরাস্ত হবার পর যখন কুর্নিশ করে লোকে
গাছে গাছে বেজে ওঠে ঝড়ের সংকেত—যুদ্ধের বারুদ ওড়ে,
সুদূর বাতাসে তার সন্ত্রাসের গন্ধ পাওয়া যায় ।

করমর্দনের পর ঝুঁকে পড়ি, অন্য হাত শক্ত হয়ে থাকে,
হাতের মালিক যেন সুপারিগাছের মতো ঋজু,
প্রথা ভেঙে আমার চোখের দিকে দৃষ্টি রাখে স্থির—
যে কোনো শরীরে আছে লক্ষাধিক বছরের ভাষা ইতিহাস ।
আমি নম্রভাবে সেই দুষ্প্রাপ্য পাথরে হাত রাখি
অবনত হয়ে আসে প্রতিপক্ষ, আমি তাকে বন্ধু বলে ডাকি ।

বিবর্তনের নিচে

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

ও এ বাড়িতে থাকে না,
তবে রোজই একবার পাহাড়ের ছায়া ছুঁতে আসে।
ও নিজেও এখন ছোট্ট একটা পাহাড়।
মা বেঁচে থাকতে ও অবশ্য একজন মানুষই ছিলো।
পানের নরম চারা গজাতে না গজাতেই
বরজ ঝড়ে ভেঙ্গে গেল।
তখন ও হা হা সূর্যের তলায় পাথর হতে হতে
এখন পাহাড়!
এখন ও জিপসীদের পোশাক পরে চুল বব্ করেছে।
ওর কানে বড়ো বড়ো আকাশপাখির ঠোঁটের মতো রিং।
এই নেই-মানুষকে দেখে হয়-মানুষেরা হাসে।

ও এ বাড়িতে রোজ একবার ওর বাবাকে ছুঁতে আসে,
কিন্তু আকাশে ডুবসাঁতার কাটা পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত
পেঁছয় না ওর হাত।
সোফার এককোণে বসে অডেন বা বোদলেয়ারের কবিতা
আওড়ায় নির্বাক স্বরে।
নবদুর্গার মতো বাবার নতুন শালীরা
সাদা ওপল রঙের ঘন্টা হয়ে বাজতে বাজতে
ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যায়।
টিকোজির ভেতরকার উষ্ণ আপ্যায়নে তাদের সন্ধ্যা
সুন্দরী বকপাখির মতো হালকা উলকাঁটার পায়ে
নিথর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুখমাছ খায়।

ঘরের উত্তর কোণে সিংহের হাড়ের গড়ন চেয়ারে
বসে থাকেন ওর বাবা।
জটিল গ্রাফের মতো তাঁর মনে পোড়া নীল রেখার অনেক গিঁঠ
মাড়িয়ে মাড়িয়ে সময় হাঁটে।

আমার মেয়ে

মল্লিকা সেনগুপ্ত

যে মেয়েটি পুড়ে গেল
তার নাম বই

যার জন্য মনীষীর নিদ্রাহীন রাত
যার জন্য উৎসুক পাগল কিশোরী
মেধাবী পুরুষগুলো যার জন্য যুগে যুগে দিওয়ানা হয়েছে
গ্রন্থাগারে যার জন্য দাঁড়ায় প্রহরী

যার জন্য সারা কলকাতা
শীতের বিকেলে এসে জড়ো হয়, ধুলো মাখে চুলে

যাকে ভালোবেসেছিল বলে
মৃত্যুর অধিক এক যন্ত্রণায় মরেছিল খনা
যার জন্য নির্বাসিত মিলান কুন্দেরা
ঘাতক পেছনে নিয়ে পালাচ্ছে রুশদি
সামান্য অক্ষর হয়ে, কালো তিল হয়ে
ওই বুকে এতটুকু মুদ্রিত হওয়ার লোভে
হাজারও বিলাসদ্রব্য ফেলে
যাকে আঁকড়িয়ে বেঁচে আছি
যার জন্য স্বপ্ন দেখা সারাটা বছর
সেই মেয়ে দাউ দাউ জ্বলে গেল কেন?

আমার নিষ্পাপ কন্যা কার পাপে তন্দুরে পুড়েছে?

পুড়েছিল,
কিন্তু ওই আদিগন্ত ভস্মরাশি থেকে
নতুন যে মেয়ে আজ উঠে দাঁড়িয়েছে
তারও নাম বই।

ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

এইবার একটু স্থির হয়ে বোসো তুমি। তোমার ঝুলি তার সর্বস্ব নিয়ে নড়েচড়ে উঠছে এবার। আর আমি তোমার সামান্য হাওয়ায় আমার আরও সামান্য আঁচল বিছিয়ে বসেছি শুনব বলে।

হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, সারাদিন চারপাশের সমস্তকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঠিক, তোমার দক্ষিণ ও বাম চোখ দু-একবার চুরি করে তাকাতে চেষ্টা করেছিল পুরুষ-মায়ার দিকে। কিন্তু মাটিতে-লুটিয়ে-পড়া ওই দ্বিধার জিভ আর কপাল-আলো-করে-ফোটা তৃতীয় চোখটি জানে, আরও নিবিড় করে প্রকৃতিকেই তুমি জানতে চেয়েছ বরাবর।

ডিসেম্বরের গোড়াতেই সেবার বরফে ছেয়ে গেছে শহর। জেকব আর ভিলহেল্‌ম, দুই ভাই, যখন ক্রুর চোখে লিখছেন তুষারকণার নিষ্ঠুর সৎমা কিংবা সেই কেশবতীকে গাছঘরে আটকে রেখেছিল যে-ডাইনি, তার কথা— তাঁরা জানেননি, এসব গল্প আসলে তোমারই শরীর-থেকে-উঠে-আসা মাটি আর আগুন দিয়ে অনেক, অনেকদিন আগে তৈরি। তুমিই একমাত্র জেনেছ, মৃত্যু এক নিস্ফলা নারীর পুনর্নির্মাণের খেলা —যা তার বিষমাখা আপেলে, তার শ্বাপদ-ভরা বনপথে ক্রুদ্ধ শোকের মতো ছড়িয়ে থাকে। চুলের গহন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে শুঁয়োপোকার-মতো-উঠে-আসা কোনও পুরুষকে স্ত্রী-সংসার থেকে যে সরিয়ে রাখতে চায়, সেই প্রহরিণীকে তুমি অন্তত কোনওদিন ডাইনিদের শূন্যে উড়িয়ে দিতে চাওনি।

শীতল-করা মরুভূমির অন্ধকারে পথিক তাঁবুর সামনে ঝিমোতে-থাকা আর্ত উটের মুখের কাঁটায় নিজের রক্ত মিশিয়ে দিয়ে সহস্র-এক রাত তুমি যে-কিসসা শুনিয়েছিলে, আমার এখনও মনে পড়ে, তাতে যুদ্ধপরা মেয়েদের অভিযানের রোমাঞ্চ স্তরে-স্তরে লেগেছিল।

তোমার কুঁড়েঘর, শুষনিশাকে-ছাওয়া পুকুরপাড় আর ছেঁড়া কাঁথার প্রান্ত থেকে যে-সব দুধসাগর আর রূপতরাসি কথাকে তুলে এনে উল্টে-পাল্টে শেষ-উনিশশতকি বাংলার ছকে মাপসই করে বসানো হল, তারা আর তোমার মুখের কথা রইল না, যা শোনার জন্যে আমি রাত জাগতাম একদিন। সেখানে যাদের চোখ থেকে না-পাওয়ার আগুন বেরোয়—তারা

কেউ পুরুষ নয়, তারা আমাদের মতোই রাক্ষুসি আর মায়াবিনীর দল— ডাইনি বলে জানগুরু আর পঞ্চায়েত-প্রধানেরা দিনশেষে তাদের পুড়িয়ে মারে।

হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক যে, তুমি ক্রমশ কবিতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। তোমার রূপকথা বেঁকে যাচ্ছে ধারালো সব পঙ্‌ক্তির দিকে—বদলে দিচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল - কুসংস্কার ছুঁয়ে বেঁচে থাকতে-থাকতে হঠাৎ তোমার কলমে ঝলসে উঠছে যা যুক্তিমালা, যা নতুন বিজ্ঞান।

তবু আজ আমি, তোমার মুগ্ধ পাঠিকা, তোমায় বলতে এসেছি, আর বেশি সময় বাকি নেই। তুমি একটু স্থির হয়ে বোসো। সারাদিন সবকিছু ভেঙে-চুরে গেছে, তবু যে-লেখা সাড়াবিহীন হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার, তাকে ডাকবাক্সে ফেলার জন্যে ছেঁড়াচটি বয়ে-বয়ে রাস্তার ওপার অবধি পেঁছনোর কথা ভেবো না আর। আমি গলবস্ত্র হয়ে প্রথম সারিতে বসেছি, পর্দা উঠতে বেশি দেরি নেই। এই শেষের ক-মিনিট তুমি স্থির হও— চিকের আড়ালে সবাই খুব শব্দহীন অপেক্ষা করছে।

পাঠক

সংযম পাল

মনোমুগ্ধকর কিছু কথাবার্তা শোনা যাক্‌ ঃ

তুমি যত ত্যাগ করো আমি তত ভালোবাসা বীজ
তুমি যত ছাই দাও আমি তত দাক্ষিণ্য ছড়াই
তুমি যত ফণা মারো আমি তত ওঝার ওষুধ
তুমি যত একা আমি তত আজ দু'পায়ে পড়েছি

তুমি যত কবি আমি ততবার পাঠক হয়েছি

সরলরেখার দিকে

রাহুল পুরকায়স্থ

তাঁবেদারি ব্যতিরেকে যোগ্যতা ছিল না অধীনে
যদিও ফলার হল, হাতচিঠি হল
মহীনের ঘোড়াগুলি কালে কালে চিনিল অক্ষর
নিরপেক্ষ পথশিশু, আত্মাহীন স্বর
কাঁপাল দিগন্তরেখা ; তবু প্রাণ, মরিচাসম্বল
রাতে যায় দিবানিদ্রা, চন্দ্রাহতে দেখে যায় দিনে

দুই

মতের ফারাক হেতু জেনে গেছ প্যারেডের মাঠে
নির্বাচিত ঘোড়া আর চাতুর্যপ্রণীত
মহান আত্মার দৌড় এই শীতে
দেখে ফেলা ছাড়া কোনো কাজ ছিল না আমার

তিন

নিভৃত সোপান তুমি, অন্তরীক্ষ, তুমি মহাযান
শাল গায়ে শুয়ে আছ গাড়িবারান্দায়
মুনাফাজনক তুমি, চিনেছ জটিল ঘাম, স্বেদ বলি যাকে
সঠিক তোমাকে জানি, এই কথা, কখনো জানি না

চার

একটি শামুক শুধু, একা একা, এসেছে শহরে

বাসনা

জয়দেব বসু

খাওয়া হয়নি শালিধানের চিঁড়ে
খাওয়া হয়নি সোনামুগের ডাল,
দেখা হয়নি পুণ্যিপুকুর ব্রত
স্বপ্নে আমার বউ আসেনি কাল

ও জ্বর, তুমি এসো না এক্ষুণি···

ছোঁয়া হয়নি বাদার মুথা ঘাস
ভ্রমরকালো সোনাই দীঘির জল,
ঘোরা হয়নি বনবিবির থান
মাজার জুড়ে চেরাগ ঝলোমল

ও জ্বর, তুমি এসো না এক্ষুণি···

আজো তোমায় দেখা হয়নি সখী
ধরা হয়নি লতিয়ে ওঠা হাত,
লেখা হয়নি কবিতা একটাও
সারা হয়নি আখরি মোনাজাত

ও জ্বর, প্লিজ, এসো না এক্ষুণি···

বিবাহ

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

জেনো তাকে সুসময়, সুপ্রভাত বলে জেনো—
ঘুমন্ত মানুষ যদি ঘুম ভেঙে পাশে দেখো:
এবং নিঃশ্বাসে তার তোমারই কাঁধের 'পরে
পালক-বীজন বলে মনে হয় কোনওদিন।
বিবাহ এমনই—এর বেশি কিংবা কম নয়,
যে যাই বলুক, কোনও মকরন্দ নয়, তবু
মায়াবী শরীর দিয়ে বিছানা উজ্জ্বল হলে
সেও এক তন্ময়তা। প্রগাঢ় আশ্লেষ আর
দংশনের পরে একটি চুম্বনের সার্থকতা—
আসলে বন্ধনে থাকা পরস্পর মন নিয়ে,
অণিমা লঘিমা কোনও প্রাপ্তি দিয়ে কথা নয়;
সহজ বন্ধন এক। তবুও যে কুঁড়ি আর
কীটের সম্পর্কে এত কথা হয়, গান হয়,
আকাশবিদারী সব তর্কে ওঠে এত ঝড়,
কুঁড়ির গভীরে নেমে সেও এক বিচলন—
কীটের ভ্রমণ যেন, পিঁপড়ের চলাফেরা।
কুঁড়ির পরতে কোনও শ্রীমন্ডল আছে কি না,
এই এক প্রশ্ন নিয়ে অবিরল যাতায়াত।

লেডিজ হোস্টেলের চিত্রনাট্য

জহর সেনমজুমদার

রাস্তার পাশেই লেডিজ হোস্টেল। ওপাশে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক।
এপাশে মহাত্মা গান্ধী রোড। কাছেই সিনেমাহল।
অনবরত লোক আসছে আর যাচ্ছে। অফিস ফেরতা লোক।
সিনেমা ফেরতা লোক। তাদের মধ্যে অনেকেই চলাচলের সময়
জানলা দিয়ে টুক্ ক'রে অদ্ভুত অদ্ভুত চিঠি গলিয়ে দেয়।
সেসবে লেখা থাকে ঃ
···রুমা, আমি তোমার সঙ্গে শুতে চাই···
···মায়া, একহাজার কিস নাও···
···স্বপ্না, কি কমডোম কিনবো বলোতো···
···রত্না, ব্রাউজের সেফটিপিনে থাকো কি করে···
···ঋতু, ঋতুদর্শনের তারিখগুলো জানাও···

লেডিজ হোস্টেলের বয়স্কা মহিলা সুপার, প্রতিদিনই এ-রকম
অনেক অনেক কুড়িয়ে পান। তার গা ঘিনঘিন করতে থাকে।
চোয়াল ফুলতে থাকে। কিন্তু কি করবেন? কাউকে কিছু
বলবার নেই। করবার সাধ্যও নেই। তাছাড়া
হোস্টেলেরও তো সব মেয়ে সাধুটি নয়, বরং
লুকিয়ে লুকিয়ে মধুটি খায়। এইতো, এইতো সেদিন
লিপিকা অফিসের কার সঙ্গে লুটোপুটি খেয়ে
বাধিয়ে বসলো। তারপর নগদ হাজারটি টাকা গুনে
পেট খসিয়ে তবে ফিরলো। এখন জানলার শিক ধ'রে
দাঁড়িয়ে হাবাগোবা, কথা বলে না, সমস্তসময় চুপ
সন্ধ্যেবেলা ঘুরতে ঘুরতে আজও অনেকগুলো চিঠি এলো
তাঁর হাতে। সবকটা ফেলে দিতে দিতে একটায় এসে
তিনি চমকে গেলেন। সারা শরীরে নেমে এলো হিমস্থবিরতা।
বয়স্কা মহিলা সুপারের চোখের সামনে
দুলতে থাকলো কাঁপা কাঁপা তিন চারটে লাইন ঃ
···আমার মা-কি এই হোস্টেলে থাকে···
···আমার মা আমাকে ফেলে পালিয়েছে···

...আমি তাকে খুঁজছি...

—ইতি ভ্রূণ—

মহিলা সুপারের মাথা ঝিমঝিম করে। চিঠির টুকরোটা
ফেলতে গিয়েও পারলেন না। হাত কেঁপে গেল ;
ধীর, মন্থর, হেঁটে গেলেন একুশ নং ঘরের দিকে।
ওইতো, জানলার শিকে মাথা হেলিয়ে লিপিকা ;
কাছে, খুব কাছে এসে মাতৃমমতায় দাঁড়ালেন তিনি।
আস্তে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন—ছি ভাই, কাঁদেনা।
বলেই চিঠির টুকরোটা দেবো দেবো করেও কিছুতেই
দিতে পারলেন না। ভেতর থেকে কে যেন বললো

ওরইতো চিঠি ওরইতো চিঠি দিয়ে দাও ওকে দিয়ে দাও
একুশ নং ঘর থেকে ওইতো বেরিয়ে এলো লেডিজ হোস্টেলের
মহিলা সুপার ; আমরা জানি, ওর ব্লাউজের ভেতর চিঠির
টুকরো কাগজ রয়েছে। ভ্রূণেরা যেখান থেকে চোঁ চোঁ
দুধ টানে, ঠিক সেরকম জায়গায় থেকে গেছে। হয়তো
আরো আরো আরো বহুকাল থেকে যাবে। কিন্তু
দুধ পাবেনা। কাগজটুকরোর ভ্রূণ কোনোদিনো দুধ পাবেনা।

অ্যাসাইলামের সকাল

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

—ঘুমের ভিতরে তুমি কী কী দেখে থাক
—দেখি বান্ধবীর শোকমূর্তি। তালগোল পাকানো বাচ্চাদেরও
দেখি রোদ্দুরে একটি শুঁয়োপোকা আর প্রজাপতিজন্ম তার
ঝলমলে, দূরে বাঁকাঠোট পাখিটি অপেক্ষমান, তা-ও দেখি
...কিন্তু ডাক্তার, হি-হি, তোমাকে দেখিনি একদিনও
—কোনও যুবকের চোখ? কোন নীল রতিদৃশ্য?
—ভুলেছি বলতে, ভোরে প্রতিদিন একটি নৃমুণ্ডশিকারীকে স্বপ্নে পাই

কুঁচকে যাওয়া আকাশ

নাসের হোসেন

জলে কতকগুলো পাতা ভাসছে, ছায়া ছায়া, শব্দহীন
এই প্রান্তরে
পাশেই খুব বার্ধক্যে কুঁচকে যাওয়া আকাশ
নীলাভ লাবণ্যের উপর আঁচড় বসিয়েছে সময়ের থাবা
জল বইছে, কিন্তু শব্দ নেই, যেন কোনো দানবিক
ইশারায় সবকিছু শ্লথগতি
গাছের ডালে ডালে ঝুলছে পাখির কংকাল
এমনকি একটি মর্কটও অদ্ভুত ভঙ্গির ভাস্কর্য
এরকম অসময় এরকম হৃদয় ভেঙে যাওয়া সুর
বুঝি আগে কখনো বাজেনি

শুধু আমি এই দৃশ্য অবিশ্বাস করি, আর অবিশ্বাস করি বলেই
দু'হাত ছড়িয়ে বলে উঠি : ভালোবাসা হয়ে যাক

যৌথকবিতা

রূপা দাশগুপ্ত

কুসুম, তোমাকে আমি নিয়ে গেছি কতদূরে বলো
দেখিয়েছি ঝরাপাতা, ঢুলুঢুলু শিখণ্ডির দেশ
দেখিয়েছি রকে বসা ছেলেটির বখাটেমি যত
ভালোবেসে কোন মেয়ে কিভাবে ফিরিয়ে নেয় ঠোঁট

দেখিয়েছি, মেলা শেষে কাতারে কাতারে লোকালয়
কিভাবে বেলুন কেনে, ঘরে নিতে হাওয়া সংকট
কার ঘরে ঘুমডোর, কার কার পকেটের নয়া
ধর্ষণ ডেকে আনে কোনাভাঙা চোখের পাতায়

কবে মেঘ নীল হয়, নীল থেকে ডোমের কৌপীন
ঋতুমতী ছোটবোন ভেসে যায় ক্ষয়ের খেলায়
অথবা স্নানের মেঝে ভিজে ওঠে বাসাভাঙা ডিমে
কোন কোন হেডলাইট দ্রুতগামী বেহদিশ ছুটে

পাহাড় দু কাঁধে রেখে যে মানুষ খুঁজেছে জীবন
ঝড় তার লুডো, তবু ভাঙনের সিঁড়িগুলি স্মৃতি
সে যখন নদী দেখে, সে যখন গাছেদের কাছে
পুরনো বন্ধুর খামে ক্রমে ঘ্রাণ চিড়িয়াখানার

দেখেছো আকাশ যার খেয়ে নেয় স্বাভাবিক বাঁচা
শান্তি দু'ফুট জেনে পাড়ি দেয় উল্টোমুখ ঢেউয়ে
তেমন পাগলজন সময় পেরিয়ে যদি সাথী
বুকের গভীর থেকে উথাল পাথাল পথকথা

কিছুই হয় না বলা, কেবল আঘাত বিনিময়
শ্যাওলা অপেক্ষা করে, শ্যাওলার জড়িবুটি রাত
ঘড়িতে ফেরার বাস, অনাজন শেষ ট্রামে এলো
ফুটপাথে ছায়াছবি, ফুটপাথে কাগজ উৎসব

ট্রামলাইন ফিরে চলো, ছুঁয়ে আসি মুহূর্তের ওড়া
দেখেছো ডুগডুগি ভালো বাজে ঐ সরল পাঁজরে

কোথায় পালাবে তারা জঙ্গল চালাক বিনোদন
অভিযান দীর্ঘজীবী আকাশের আলকাপ খুলে

নিহত মায়ের মেয়ে তারকার পিছু দিশাহারা
নিহত মায়ের মুখ ডায়েরীর চোরাখাত লিপি
এসব প্রেমিকও বোঝে, তবু তার বয়সের চাওয়া
বোঝে না ফুলদানি জুড়ে রজনীগন্ধার ছড়া টানা

একটি শিশুর মুখ হন্যমান স্কুলের টীকায়
একটি শিশুর মুখ দেওয়ালে দেওয়ালে ঠোকে মাথা
দেখে দেখে খুব হাসে শহরের প্রতি বাতিদান
মাঝে মাঝে পথচারী দু'হাত বাড়িয়ে দেয় আহা

সেই হাত সাঁড়াশির সেই হাতে বারুদ বা শোর
তারও চেয়ে অভিমানী অসামাজিকের একা থাকা
বাজারে শ্যাওলা বেচে বাবাতুতো হয়েছেন যাঁরা
তাঁদের দপ্তরীগণ গুণে রাখে জেদীদের ভুল

কুসুম, তোমাকে আমি নিয়ে গেছি কতদূরে বলো
চিনিয়েছি ছেঁড়াপাতা, আশ্চর্য সময় আর ব্যথা
তুমি যত ছুটে আসো আমি আজ ততগুণ স্রোত
ফারাক ঘূর্ণি ছুঁয়ে ক্ষ্যাপামি বা যৌথকবিতা।

দার্জিলিং বা তিস্তা তোর্সা

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রুকস্যাক, ঘাম, রাতজানালা, ঘুমদুরন্ত পাহাড়তলি
ঝুলনদোলায় শহরটা আজ দৌড়ে দৌড়ে পেরিয়ে যাচ্ছে
দুপুর পথের ঘোর পিছুটান কামড়ে রাখছে পায়ের চটি
আঙুল ছুঁলাম, জিরো থ্রি থ্রি, হিম ঘুমন্ত তোমায় ডাকছি

তখন তুমুল বসন্ত তাপ, কৃষ্ণচূড়ার লাল পতাকা
সমাজবাদের চেয়েও তীব্র যৌন, মার্ক্স বা লেনিনবাদী
নীল নাইটি লেসের ফ্রিলে স্বপ্নচারী প্রার্থনাসুর
আমার কলেজ যাবার গানে রক্তপাপড়ি বিছিয়ে দিচ্ছে

ম্যাকবেথে সেই শ্মশান ডাইনি, দেখিয়েছিল জাদু আয়নায়
পাগল লিয়ার আমার মতন মূর্খ কুব্জ ভাঁড়ের সঙ্গে
সিংহাসনে নাচবে বলে কালকা মেলে জ্যোৎস্না দেখছে
সব নাটকই প্রেমের গল্প – রুগ্ণ ক্ষিপ্ত ইয়েটস বলছেন

পদ্য ছাপার অহঙ্কার? না, মনে ছিল না তোমার কথা
হঠাৎ যেদিন বৃদ্ধ মাতাল স্বেচ্ছাচারী শাক্ত কবির
মৃত্যু বিজ্ঞাপিত হয়েছে, মনে পড়ছে তোমার বাবার
অকালমৃত্যু, ছোট্ট ভাইয়ের অবোধ প্রশ্ন, আষাঢ় শ্রাবণ

শুকনা, মিরিক, ঘুম, সোনাদা, বাতাসি লুপ, টুং ছাড়িয়ে
উড়ছে বয়ঃসন্ধি ঘুমের ত্রিকালজাগর রাতুল স্খলন
সাক্ষী শুধু তারার চক্ষু, আর যে একক আলোকযাত্রী
সাগর, পাহাড়, বুকের হাড়ে অনন্তকাল মানুষ গড়ছে

লেসের ফ্রিলে তিস্তা তোর্সা, রুকস্যাক বেল্ট জড়িয়ে যাচ্ছে
নশ্বর এই স্নানের শরীর চু-কিৎ কিৎ খেলতে খেলতে
কড়ে আঙুলের ইচ্ছে ছুঁচ্ছে হিম ঘুম রাত জিরো থ্রি থ্রি
জন্মশহর স্বপ্নশহর পরাগ মিলন দেখতে চাইছে

অতি আবশ্যিক পণ্যদ্রব্য

সুতপা সেনগুপ্ত

ফাঁকিবাজ ছাত্রের মতো সমস্ত অজুহাত একদম মুখে মুখে তৈরি আছে
কিভাবে তুলোর দাম পয়সার ঘষা পিঠে চমকে খসে গেছে
কিভাবে প্রণতি নামে মেয়েটির স্কুলের খাতায় আঁকা ছিল
অবিভক্ত জার্মানির ছবি, পিয়ের ল্য ফু দেখে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের
যাবতীয় তরুণ তরুণী চলে যেতে শুরু করেছিল কাঁথি সুন্দরবন এলাকায়
এসবের তদন্ত হওয়া চাই বলে কারা প্রতিদিন এক দফা আলোচনা
সারছিল আমাদের ট্যাক্সের টাকায়
কিভাবে আমাদের ল্যাজে-গোবরে হওয়া শান্ত ঈশ্বরটিকেও
সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়
তার জ্বলন্ত উদাহরণ মেখে আত্মহত্যা করেছিল কতজন অ্যান্টি-মণ্ডল
বাবরি মসজিদ ভাঙা কিভাবে কী আশ্চর্যভাবে এ পৃথিবীর ইতিহাসে
ফার্মা উপপাদ্য হয়ে গেল
কিভাবে চায়ের কাপে সিকি চামচ চিনি বেশি পড়লে ভোরবেলা
খবরের কাগজসহ মধ্যবিত্ত
দুর্বোধ্য ডাংকেল সাহেবের আধুনিক কবিতার মতো দুরূহ প্রস্তাব নিয়ে
পারস্পরিক পরামর্শ করে
কিভাবে সম ফ্রেনজি নামক বোতল-ভাঙা জিনটিকে দেওয়া হচ্ছে
ডাকাত-মারার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড
কিভাবে দুহাতে চাপড় মেরে সংসদের টেবিলে, চ্যাংড়া ছেলেদের মতো হল্লা মচিয়ে
বাইরে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির ইঁটে সিমেন্ট চাপাচ্ছে ছোট্ট রুপোর কর্ণিক হাতে
আমাদের ভোটাধিকার বলে প্রাপ্ত ইয়েস মিনিস্টার সকল,
কিভাবে বর্তমান-অবলাবান্ধবগুলো নমুনা সহযোগে অশিক্ষিত মেয়েদের
ধ্যাষ্টামো ও নষ্টামো শেখাচ্ছে
কিভাবে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে একটি জ্যাকেট কেনার লোভ
আমাদের ফিমার বেয়ে শিরশির করে উঠে এসে
চুলের গোড়ায় জমা অবচেতনাকে দাঁতে কেটে, ফ্যাশন ম্যাগাজিনের বিক্রি
বেফালতু বাড়িয়ে দিচ্ছে
কিভাবে খনিজ জল ছাড়া আমাদের হজম ব্যবস্থা আর ঠিকই থাকছে না

কিভাবে বিপ্লবী যুবকেরা নিজস্ব মোটরকার ড্রাইভ ক'রে
দারিদ্র্যসীমার জেব্রা ক্রসিং পার হতে হতে
চলে যাচ্ছে আরো প্রগতিতে,
কিভাবে তৃণমূল বলে কিছু থাকছে না, যেহেতু সমস্ত ঘাসজমি যাচ্ছে
ভেড়ির দখলে

কিভাবে হিন্দু-মুসলমান এবং ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের পর
নর্থ ক্যালকাটা বনাম সাউথ ক্যালকাটা নামে
আরো সূক্ষ্ম একটি প্যারোকিয়ালতা ফনফনে হয়ে উঠছে
কলকাতার কিচেন গার্ডেনে,
কিভাবে ঘোড়ার জুয়ো, রিগিং, দ্বিজাতিতত্ত্ব, ময় ভি ম্যাডোনা,
ডাবলিউ ডাবলিউ এফ

ও পশ্চিমবঙ্গের রুগ্ন শিল্প নিয়ে সরগম ভাঁজছে
আমলা ফাইল খ্যাত ক্রীমি-লেয়ার
কিভাবে সমাজনীতি, কিভাবে ট্যাকটিক, কিভাবে সিরিঞ্জ এবং কিভাবে কাশ্মীর
কিভাবে ভিডিও নেশা, কিভাবে ভোটের ব্যাংক, কিভাবে হেপ জগতের
ক্রমবর্ধমান আঙুল শাসানো,

কিভাবে এইড্স-ভয়, ধর্ষণ কিভাবে
এই সমস্ত কিভাবের সঙ্গে সুপারহিট দু নম্বরি মুকাবিলা করেও
যদি আমি একটি কাঁচা নওলকিশোর হয়ে থাকতে পারি,
এবং পার্টিতে পার্টিতে নিজ হাতে ককটেল বানিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের
পটাতে পারি,

প্রিয় নন্দলাল, আমিও একদিন সক্রিয় রাজনীতি করতে প্রস্তুত থাকবো
যে রাজনীতি, আপনাদের ভাষায়, পারসোনাল কম্পিউটারের মতো,
গড়ে প্রতিটি মানুষের, আজ অতি আবশ্যিক কমোডিটি।

অন্ধকার

শবরী ঘোষ

(১)

শীতরাতে আমাদের তাঁবু পড়েছে দিকচিহ্নহীন, অন্ধকার মাঠের মধ্যে। আগুন জেবলে আমরা তার চারিপাশে ঘন হয়ে বসেছি; সুখের ওমে সেঁকে নিচ্ছি আমাদের ক্লান্ত শীতার্ত হাত পা।

কুট চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা হিসেব করছি, কে কতটা উত্তাপ বেশী পেয়ে গেল। থাবার চতুর নখ লুকিয়ে রেখে পরস্পরের ঘাড়ে হাত রাখছি; বন্ধুত্বের! আর খুব গূঢ় নিপুণতার সঙ্গে চেষ্টা করছি অন্যকে বৃত্তের বাইরে ঠেলে দিয়ে আলো এবং উষ্ণতার দিকে আরেকটু এগিয়ে যাবার।

ভয়ংকর জটিল এই অন্ধকার ও শীতলতার মধ্যে বসে আমরা প্রেম ও আনন্দের কথা বলছি। গাইতে হয় বলে আমরা তারস্বরে গেয়ে চলেছি—

"আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও..."

আমাদের কারো সুর অন্যের সঙ্গে মিলছে না।

(২)

দেব-প্রাঙ্গণে ভোর হল।

দিনের প্রথম আলো ছুঁয়ে একজন দু'জন করে মানুষ আসছে—
হাতে পুজোর ডালি; কণ্ঠে প্রার্থনা।...
বেলা বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে মন্দিরে। জমে উঠছে ফুল, মালা।
জমে উঠছে নৈবেদ্যর স্তূপ। বাতাসে মন্দ্রিত হচ্ছে গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি;
ব্যাকুল বন্দনাগান।

ফুলগুলি ফুল নয়—ছদ্মবেশী লোভ। মন্ত্রগুলি—মোসাহেবী।
নৈবেদ্যর ডালি—টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া নির্লজ্জ
উৎকোচ।

শুধু দেবতার জন্য ফুল আনেনি কেউ।
শুধু ভালোবাসবার জন্যই কেউ ভালো বাসে না।

রঙিন ময়ূর

অরূপ আচার্য

চান্দিকে কালো প্রেত-মন্দির
মসী নিয়ে অসিখেলা, ভুতুড়ে জীবন, অপমানে ক্লেদরক্ত,
অভিমান মাড়িয়ে যায় ঘুঘু।

কোথাও ছুটে গিয়ে পাইনি পাহাড়, নীল জলরেখা
মাঠের কোকিল হারিয়ে অন্ধকার রঙে
নিজের গোপনে তবু নিমগ্ন পাখির পালক
বাজপাখি পাখায় ঢেকেছে আজ মানুষের মুখের বিভাস
সাদা কবুতর ছুটে গেল কেন ঘোর বনের ভিতর?

আলোর গান্ধীপোকা কোথায় জ্বলল, রজনীর চাঁদ
মশারীর নিচে চোখ ধাঁধানো আলো দেখে
কচি খোকা ভাষা হারিয়ে বেমক্কা বলে ফেলল ঃ
'অন্ধকারটা জ্বালিয়ে দাও না।'
সেই কথার জের টেনে আলো সব নিভে গেল।

শিরীষের মাথায় সূর্যের রং তামাটে এখন
উঠোনের ধুলোবালি, ধূসর জীবন ঘোলাটে রক্তের মতন খেলা করে।
'ছোট'র ভিতরে মাথা নিচু করে ঢুকে গেছি
আমি স্বদেশে পলায়নে আছি
আপনাদের কাছে অনুরোধ আমাকে কেউ খুঁজবেন না
আমি অন্তঃপুরে নিবাসী।

এখানে মুখ বাড়ালেই আমার বাসনা বড় হয়ে গাছে উঠে যায়
অন্ধকারের কালি যদিও আমায় কালো করে দেয় বসন্তে
আমি তবু কবিতার শব্দের ভেতরে রূপবান
জীবনের রঙিন ময়ূর।

রসযোগ

প্রশান্ত মল্ল

চার পাঁচ মাইল দূরের তেহাই গাঁ হতে
রামী নানুরে কাপড় কাচতে আসত
তখন কি জলাভাব দেখা দিয়েছিল?

এতটা পথ বোলমাখা ঝুড়ি কাঁখে রামী একা একা আসত
পথপাশে ধু ধু মাঠ দেখে নিশ্চয়ই তার গড়ন হু হু করত
গয়ামুটি খোঁপা বেঁধে আটপৌরে রামী
দুপুর হতে বিকেল রানায় থুপে থুপে কাপড় কাচত
খোপার ছন্দে তার স্তন নাচত, নব্বই ডিগ্রী শরীর টানু টানু
একটু কাত হলে প্রকট ত্রিবলী।

অপর পারে চণ্ডীঠাকুর ছায়ায় ছিপ ফেলতেন
রামীর অবয়ব নির্জন ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে চারে আসত।
সেই বিন্দুসরোবরে কত কি যে ঘটত—
বর্ষা যেমন আকাশ ধোয় তেমনি চণ্ডীদাসকে
উজ্জ্বল করে তুলল।

মহাজগতকে ধবধবে করতে অনাদি হতে অনন্ত—
রামী আজও কেচে চলেছে।

ঘুম

নিতাই জানা

দুঃস্বপ্নের মতো মেঘ সারারাত জুড়ে খিলখিল হাসি
থেকে থেকে ঝলসে ওঠে ধারালো দাঁতের মতো নীল শেয়ালেরা
ধারালো করাত তোলে মরা কাঁকড়ার দল না না ঝাঁসির
মহারানি ছুটছেন খোলা কৃপাণের মতো পঞ্চতন্ত্র পড়া
রাজকুমারেরা কানে কাঠি দিয়ে হাই তোলে ভেসে চলছে ডুলি
হালকা মেঘে চাঁদ যেন কচ্ছপের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘুমো খরগোশ

কাঞ্চি থেকে কলকাতা কিংবা বোম্বাই দিল্লী কুকুর কুণ্ডলী
মানুষের চোখ-মুখ ব্যাঙের আধুলি যেন এমন সন্তোষ
বর্ণসারণীর মতো শিশুদের করজোড়ে প্রার্থনার গান
হাওয়া আর বুদবুদ দু'একটি মুখ ঘাই দিয়ে ফের ডুব
সমতলভূমি থেকে ভেড়ার পালের মতো হেঁটে আসে ধান
সমতলভূমি ঠায় শ্বেতবামনের মতো রাত টাপটুপ

ঘুমের মতন ভারি ইঁদুরেরা মাটি তোলে তবু ঘুম নেই
যেমন নানার পাগড়ি নিজের মাথার চেয়ে ভারি হয়ে গেছে
অথবা বিদ্যুৎচুল্লী আলোর চেয়েও দ্রুত কয়লার ছাই
হাওয়ায় ভাসিয়ে আনে নির্জন রাত্রিটিকে শ্রান্ত গ্রামদেশে
হাওয়ার মতন ছোটে নীল নীল শেয়ালেরা পৃথিবীটা গোল
ছোট তাই অত দেখা যেমন হলুদ গল্প নায়ক নায়িকা

ইচ্ছাপূরণের মতো কবিতাও খুলে ধরে নারীর ভূগোল
ছাত্রটি দুলে দুলে মুখস্থ করে যায় গুরুবাক্য টীকা
ধূসর ধুলোর মতো উড়ে আসে শীত আর পাতারা অবুঝ
বক্তৃতার শেষে যেন হাততালি ঝরে পড়ে ঘুমে সাতপাক
ঘুরে এলো মরুভূমি ধোপার গাধাটি পিঠে দীর্ঘ এক কুঁজ
কুঁজ পথ ঠেলে ঠেলে রেশম সড়ক ছোটে ইরান ইরাক

উপসাগরের ঢেউ আগুনে পাগল যেন উপমহাদেশ
ফোঁটা ফোঁটা রক্তে রাঙা পাথরের পায়ে ঝরে পুজো দেয় ফুল
উদ্বাস্তু শিবির আর জল বাষ্প হয়ে যাওয়া একই সন্দেশ

দূরদর্শনের ঢঙে কথা বলে রাজধানী আকন্দ ধুন্দুল
বাচ্চা কোলে মা ছুটছে পেছনে ছুটছে ট্রাম যেমন মাতাল
টাল খেতে খেতে চলে টেবিলের অন্যপারে ফ্যাকাশে যুবক

ঘরের মধ্য দিয়ে হঠাৎ বাইতে থাকে কুমির ও খাল
অবিরল ছুটে ছুটে পৃথিবীরও কাশি ওঠে খক্ খক্ খক্
স্পেনের ষাঁড়ের মতো শিং উঁচিয়ে ছুটে আসে টাকার আঘ্রাণ
হুড়মুড় ভেঙে পড়ে কী বিশাল দেশ যেন বুনুয়েল ছবি
পাথরের হাত এসে নারীর সম্ভ্রম রাখে মেয়েও পাষাণ
সমস্ত ঘরের দরজা পাগলের মতো খোলে যেন কোনো কবি

সন্ধির মতো সাঁঝ যেন মাছি কেঁদে ফেরে দেশলাই খোঁজা
শুরু করে মধ্যরাত রাস্তা ঢুকে গেছে ঘরে পালাও পালাও
সাহসী যুবক ট্রাক চালাতে গিয়েই দেখে চাকাগুলো সোজা
তীক্ষ্ণ বল্লমের ফলা ঘাড় ছিঁড়ে চলে যায় সশস্ত্র ফারাও
ঘুম থেকে আরো ঘুমে শেকড় চারিয়ে যেন চোখ খোলে মমি
নর্তকীরা নেচে যায় পায়ের নূপুর নাচে অথবা নাচায়

কংসের রাজধানী কিংবা এ কলকাতা অবিকল বমি
কাতুরে শিশুর মতো ছবির বাজার বসে যেন ঘুম পায়
কাঁচাঘুম গাঢ়ঘুম ঘুমের কুমারী মুখ টিপের মতন
সবুজ ফসল আর দুধ ভরা গাই খায় পুকুরের মাছ
খোকা ডোবে ছিপ নিয়ে ছোঁ মেরে ষাঁড়টি তুলে চিল শনশন
কেবল উঁচুতে ওঠে মাছের আঁশের মতো তখন আকাশ

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে

অঞ্জলি দাশ

১.

এখনও আমাদের পা গলে যায় কচি ঘাসের ওমে, দু-হাত ধরতে ঝাঁপিয়ে আসে মেঘের নামতার পাতা। আমাদের দিয়ে এতটা কি সহজ হবে তোমাদের ভূমিকা-বদলের খেলা!

রেশমগুটির মায়া আর অন্ধকারে গা-শিরশির, এর চেয়ে বেশি নেশাবস্তু আমাদের নেই। যেখানে সম্পর্কের গিঁটগুলো ধরা থাকে, সেখানে রোজ মাথা ঠেকিয়ে ভাবি—এই-ই পূর্ণলাবণ্যের জীবন।

রাস্তার ধার ঘেঁসে সন্তর্পণে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের প্রবাস-আবাস। জানালা বলতে মুখের মাপে ইঁটখসা তিনটে ঘুলঘুলি। হাওয়া ধরে ভেসে এলে, যে-কোনও কথাকে অমৃতবাণী বলে ধরে নিই।

ভয়ে-ভয়ে লুকিয়ে-গাওয়া ভাঙাগানের সূত্র ধরে প্রস্তাবটি গেঁথে দিলে চুলের গোড়ায়। বললে, হাত পোড়ানোর ঘটনাগুলো ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতে। বুঝিয়ে দিলে হারমোনিয়ামের রিডে কেন ধুলো জমে। অল্পচেনা জলবাষ্প, ঘোরলাগা শব্দবন্ধে গিলিয়ে দিলে বিষবড়িটিকে!

সেই থেকে ঘর-বার দুটোই আমার নয়।

২.

কতদিন পরে আজ। জল আসার কথা নয় ভেবে যতই স্পষ্ট করে তাকাতে যাই, লজ্জায় নেমে আসে চোখের পাতা।

বন্ধুর ছদ্মবেশে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে যেসব দেয়াল, তাদেরও পলেস্তারা ফুলে উঠছে কথায়, ব্যথায়। কোনওকিছুকেই এখন আর অবরোধ বলে মনে হয় না। কান পেতে শুনে নিই ইঁট-বালির বশ্যতার কথা আর কণ্টের জল শুকিয়ে গিয়ে যে-রক্তচোখ, তার ইতিবৃত্ত।

কার দিকে আঙুল তুলব, বলো!

অপচয়

প্রবুদ্ধ বাগচী

ছায়া যে ডাকবেই হরিৎবৃক্ষের
তেমনই জল রং অসম্ভব
হয়তো ঠিক ছিল স্বভাববৃত্তের
পোষাকে অভ্যাসে বাস্তবিক

কেবলই গান্ধারে প্রভাব-অন্বয়
রাতের নদী বলে, দাঁড়াতে নেই
আর্ত অপচয় জলীয় ভাষাদের
শপথে দেবে কোন মরূদ্যান?

অন্ধ রাতপাখি পালকে অঞ্জলি
দেবে কি না-ই দেবে ভাবছে ভুল—
হিসেবী পথচলা শিশিরে গানগুলি
ছড়িয়ে রাখে তার সংক্রামক

ওষ্ঠে। দ্বেষভয় ভুলছে দিক তার
ডানা কি মেলে দেবে স্বপ্ননীল,
বৃষ্টি-ছাওয়া মেঘ এসেছে সংগতে
ধ্বস্ত বাহু তার অর্থহীন!

জুল ভের্ন প্রণীত দ্বীপে

পিনাকী ঠাকুর

মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকান বসাও,
তুমি আমার
দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দাও কলকাতার স্থানীয় সংবাদ!
কেমন ক'রে সেই গমের দানা
সেই ইউরেকার মতো অনিবার্য গমের দানা
জেনে রাখো আজ দাবী করছে একরপ্রতি জলসেচ
ওদের জন্য আমি ঝর্না ঘুরিয়ে দেব গ্রীষ্মের আগেই।
ভাগ্যিশ, বলতে নেই, ভাগ্যিশ জাহাজ থেকে আমাকে একদিন
নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মানচিত্রের বাইরে
তাই আমি জানতে পারলাম চাকা আবিষ্কারের প্রেরণা
স্বয়ং সূর্য
জবাকুসুমসঙ্কাশং, আস্ত, গোল, সারাদিনের সূর্য
জানতে পারলাম এই দ্বীপ আসলে দৈত্যাকার এক
প্রজাপতি ধরবার জাল…
এবার অন্তত একটা চায়ের দোকান বসাও, বলা যায় না তো
মেনল্যান্ড যদি এখানেও কাটাতে আসে সপরিবার ছুটি
ওই ওই দিকটায় রঙবেরঙের তাঁবু ফেলেই
ক্যামেরা হাতে ছুটে বেড়ায়
ছবির সাবজেক্ট হিসেবে বেছে নেয় সামান্য আমার গমক্ষেত
যদি ওদের পছন্দ হয় এই নিদ্রিত আগুনপাহাড়,
বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণগহ্বর পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা আমার
বালুঘড়ির মুহূর্ত!
আজ ভোরবেলা, কী বলব, যেন ছড়ায় ছড়া মিলিয়ে
আতাগাছে নেমে এসেছে গরীব দেশের তোতাপাখি
ভাঙা ভাঙা নার্সারি রাইম মুখস্থ বলছে
আর ডালিমগাছ?
কোনোমতে একটা ডালিমগাছ বাঁচিয়ে ফেললেও
সুদূর তোমাকে আজ কোন লজ্জায় এসে পড়তে বলি?

বলি, এই নোনা-হাওয়া পাহাড় সমুদ্র ছুটি নারকেল বীথিতে ভাই
ক্যাপ্টেনের মেয়ে
এসো এসো
বেঁচে থাকা কত ভাল আমরা এক জন্ম মরে দেখি!

দহন

বিজন রায়

যতদিন উনি ছিলেন অসম্পূর্ণ ছিলাম আমি।
এখন প্রত্যেকটি সকালে উনি আমার ঘুম ভাঙান
প্রতিটি মুহূর্তে উনি আমাকে ধুয়ে মুছে সাফ-সুতরো করেন
বিপত্তারিণী চুমু আঁকেন আমার কপালে।
এভাবে একদিকে তাঁর পান্নারঙের ইচ্ছেগুলো
খিলখিলিয়ে উঠছে, আর একদিকে
ছুটন্ত স্বপ্ন থেকে বারবার খসে পড়ছে নিমগোধূলি।

উনি এখন এ বাড়িতে থাকেন না।
তবে রোজই যখন তখন বেড়াতে আসেন।
ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় অথবা ঠান্ডা অন্ধকারে
তাঁর হাওয়া চেয়ারটি নড়ে উঠলেই
পৈতেতে বাঁধা লোহার চাবি ছুঁয়ে ভাই বলে ঃ
আয় দাদা, দুদণ্ড চোখ বুজি।

চোখ বুজে কত খুঁজি। হাঁটি।
কিছুতেই মাকে আমরা সম্পূর্ণ করতে পারিনা।
সুপুরি গাছের ছায়ার মতো দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা
চুপিসারে চুঁইয়ে পড়ে মার সিঁথিতে। ম্লান ও আচ্ছন্ন।

প্রৌঢ়জলের নিস্তরঙ্গ নদী। আতপস্নানের গুঞ্জন ওঠে।

ফাল্গুন আক্রান্ত একজন

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

চোলির পিছন থেকে চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে
গরম চাঁদের আলো গাছপালা পুড়িয়ে ছারখার
করে আর বাতায়নে বসে খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হাসে
এ পৃথিবী একবারই পায় তাকে পায় নাকো আর।

দুবার চাইতে গেলে ধাক্কা মারে, বলে—শালা, ভাগ
একবার তো পেয়েছিস, জীবনে ক'বার জ্যোৎস্না হয়?
কি ক'রে বোঝাই তাকে মুঠো মুঠো বসন্তপরাগ
বাড়িতে লুকিয়ে রাখলে রাগ করেন ঘোষ মহাশয়

ফাল্গুনের ঝুঁটি ধরে বার করেন, হুইসিল বাজিয়ে
গাছে গাছে ফুল ফোটান, মেঘে মেঘে ছুঁড়ে দেন হাঁস
উঠোন-বারান্দা-রক-দরজা-জানলা সব খুলে দিয়ে
গৃহস্থপল্লীর মধ্যে ছেড়ে দেন নিষিদ্ধ বাতাস।

ফুরফুর বাতাস নাচে গৃহস্থের পকেটে পকেটে
জামা কাচলে দেখা যায় ডি-রোয়ের দুখানা টিকিট
জ্যোৎস্নারাতে বনে গেলে ভরা আসরের তাল কেটে
পলেস্তারা খসে গিয়ে দাঁত বার ক'রে হাসে ইট!

এই বাঁধভাঙা হাসি, বলো চাঁদ, কি ক'রে সম্ভব
জীবনে আরেকবার? বলো বলো, কোথায় দাঁড়াবে
শ্যামবাজারে? পার্কস্ট্রীটে? আরও কত জায়গা বলো সব
সব মিনি, সব বাস, সব ট্যাক্সি ঐ অবধি যাবে

এসব আকুল প্রশ্নে চাঁদ আর জ্যোৎস্নার পৃথিবী
মুখে কোন সাড়া দেয় না, যা বলার বলে মনে মনে
তারপর নটা বাজলে একসময় বন্ধ ক'রে টি ভি
চাঁদ আবার ডুবে যায় ঝকমকানো চোলির পিছনে

এক অলস দেবদূতের গল্প

সার্থক রায় চৌধুরী

যাজকের সিদ্ধান্ত ভুল,—বসন্তে উত্তেজিত এইখানে ছেলেটির পাশে
পড়ে আছে ধর্মের মহান গ্রন্থ যার পাতাগুলি আপাত দারুণ
সব গাছেদের চেহারায় নীল।
পরামর্শদাতার মুখ—এক স্তব্ধ ঘন্টার মত ধাতব,—শীতল;
শুধু স্মৃতি,—আমাদের প্রামাণ্য নির্দোষিতা,
চৌকো কাঠের এক অদ্ভুত কারাগারে স্থির।—অথচ
যে লোকটি খুঁড়ে ফেলেছে পৃথিবীর অধিকাংশ মাটি,
তার দর্শন কাজ করে মাটির উপরে।
পাখিদের প্রথম বাসার ভাঙা টুকরোর কাছে গেলে বোঝা যায়—
—ওড়ার শিক্ষাশেষ, এইবার ক্ষুদ্র রহস্যময় গাঙচিল
নিজের প্রকৃত কাজ বুঝে নিয়ে উড়ে যাবে মাস্তুল বরাবর
এক চিহ্নিত আকাশের দিকে।

তুমি রোজ নিয়ে আস বীরদের অনেক কাহিনী, আর
মহানতা যেন সমুদ্রের শান্ত সাফল্যে তার পরিণতি পায়,
—বাজে শিঙা—পৃথিবীর প্রথম পাহাড়ে।
—এইভাবে শুরু হয় মিথ্যে সাক্ষ্যদান—নিচু টিলাদের কথা,
যেখানে ব্যর্থতা মূলত অন্ধকারে,—কাপুরুষতায় ভীতু সৈন্যের
সিক্ত পোশাকে গাঢ়—সেইখানে মানুষের হিংস্র মুখের ছবি,
ফুটে ওঠে সূর্যের ম্লানতায় পচে ওঠা ফল,
খোঁড়া পাখিদের চোখে দেখা যায় ঢেউয়ের প্রকৃত গঠন—
—তার খণ্ড শরীর জুড়ে সত্য কাহিনী—জাগে ডাক,—
দীর্ঘ নির্যাতিত গাধাদের—কর্কশ ময়ূরের মতো।

আজ যুদ্ধের ফেরার গল্পগুলি বলা হবে,
বলা হবে—অস্ত্রের শান্ত উপস্থিতি, ঘোলা পাথরের চোখ,
তোমার নগ্নতায় প্রথম রেশম ছিল পাখিদের ওড়ার উল্লাস
আর এইসব প্রামাণ্য বসন্তে তুমি তুলে নেবে বাইবেল,
হাসিমুখে—নীরবতা,—করুণ কাহিনী॥

সূর্যাস্তের বন্ধু
সাম্যব্রত জোয়ারদার

[আমার আকাশে অস্ত মানেই অন্যের চোখে আলো]

আলো এই হাওয়া এই শূন্যতা চতুর্দিকের ছুটে চলা পথ
আমাকে ফেরাও, পথ করে রাখো,
পথের ওপরে ভাসাও দুজন,
ও আকাশ আমি এতই পাগল
সারাদিন জলে ডুবে থাকি আর পাঁকে শুয়ে থাকি
আমায় ছোঁবে না, বন্ধু আমায় সঙ্গে নেবে না
দূরে দূরে বন, পাহাড় পেরোনো তেঁতুল পাতার
নৌকো চলায়…
ও পাতার ভেলা সবুজ নৌকো তুমিও কি বলো
এতটাই ছিলে দিগন্ত জুড়ে,
যে আলোর ঢেউ তীরে বসে বসে ভুল লেখা যেতো,
আঙুলে আঙুলে বানানো নরম বালির কুটির
সবকিছু আজ মুছিয়ে মুছিয়ে ভেসেই চলেছে
বন্ধু আমার অন্যের চোখে অন্য আকাশে…

দ্যাখো, এই বুঝি আমার সূর্য অস্ত যাচ্ছে,
দ্যাখো এইখানে ঘুমন্ত সব লিপির মুখেতে
উদ্ধারহীন লিপি আমি আজ ঘুমিয়ে পড়েছি,
ঘুমিয়ে…

আক্ষরিক
সমীর মজুমদার

টেবিলের উপরে ছড়ানো ছিটানো অক্ষরগুলো
আর বাইরে জানালার শার্সিতে বৃষ্টি
তার স্ফটিকেরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে দুষ্টুমিতে
গাছগাছালি আকাশ ইঁদুর সবই ঝাপসামতো

অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নীলঘোড়া বানাতেই
ঘোড়াটা দৌড় লাগালো দৌড়তে দৌড়তে
বনবাদাড় পেরিয়ে নদী ডিঙিয়ে পাহাড়ী চড়াই ধরলো
তখন লাল টুকটুকে এক প্রজাপতি বানাতে লাগলাম
কিন্তু ডানায় ঢেউ লিখতেই উড়ে গেল মুচকি হেসে

এবার অবিন্যস্ত রেখায় ভাঁজ ভেঙে ভেঙে আমার আঙুল
সৃষ্টির প্রান্তসীমা থেকে ডেকে আনলো উড়োজাহাজ
আর গগন লিখতেই গোঁ গোঁ—সে আকাশে ঝাঁপালো

অক্ষরগুলোকে শেষমেষ ফিরিয়েই আনলাম
এনে ছড়িয়ে দিলাম টেবিলে

আর যেন বৃষ্টি থেকে গেছে দূরে কোথাও ভাটিয়ালি
তার সুর ভেসে আসছে প্রতিধ্বনিরও ভেতর থেকে
অক্ষরগুলো সবুজ পাতা দিয়ে ঘর বানাতে লেগেছে
সেই ঘরে চালচুলোহীন তুলি এঁকে চলেছেন সূর্য
ছড়িয়ে দিচ্ছেন তার আলো ভাসিয়ে দিচ্ছেন
এক ঝাঁক বকের উড়ানে…

টেবিলের উপরে ছড়ানো ছিটানো অক্ষরগুলো
এইবার সেজে উঠছে বেজে উঠছে—টের পেলাম !

বর্ষশেষ

অভীক ভট্টাচার্য

গ্রীষ্মকালের সন্ধেবেলার মতো শান্ত রঙের একটা ঘুড়ি উড়ছে
আরও শান্ত একটা আকাশে

লাটাইয়ের সঙ্গে সুতোর কোনো বিরোধ, কোনো টানাপোড়েন
নেই আজ

এগিয়ে আসছে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন, মেয়েরা ঝুঁকে
পড়ছে ঠান্ডা সেলাইবাক্সের ওপর

দীর্ণ ফাটা-ফাটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এই একঘেয়ে লম্বা দুপুরের
পেটের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে আছে মেয়েরা যাদের বিয়ে
হয়েও একদিন দুম করে ভেঙে গেছে

আকাশে উঠেছে একটা মস্ত ধূমকেতু, তার ঝাঁটার মতো লেজ
এখন আদুরে বেড়ালের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে নেমে আসছে
ছাদে

চারদিকে কেউ আর আত্মহত্যার কথা বলছে না গৃহযুদ্ধের
কথা বলছে না কেবল বোকার মতো হাসছে কথায় কথায়

সন্ধেবেলা পাশের বাড়িতে আবার গান গাইছেন দেবব্রত
বিশ্বাস আর ঘুড়ির চারপাশে একটু স্বস্তির নিশ্বাস পাক খাচ্ছে
কুয়াশার মতো···

সন্ন্যাসী

রাণা রায়চৌধুরী

ঐ তো জীবনানন্দ দাশ হাড়গোড় ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলেন।
গেরুয়া-জীবনানন্দ। চাঁদ পার হলেন,
কসবা ব্রীজ পার হলেন,
ট্রাম তাঁকে ছুঁতে পারল না
ছেঁড়া জামা তাঁকে ছুঁতে পারল না
হেমন্তের টাকা-পয়সাও ছুঁতে পারল না তাঁকে—

বাড়িতে স্ত্রী ছিল। আলনা ছিল। আর ছিল,
আলনার নিঃসঙ্গ আত্মা।
আর ছিল সন্তান, চটি এবং অসুখ বিসুখ
মেঘ ছিল কার্নিসে, চুলে আর মনের ভিতর
আর ছিল ঝড়, ঝড়ের হাড়গোড়

এখন নেই। জীবনানন্দ নেই। ধুতি নেই। অবসাদ নেই।
অবসাদ চটির পাশে চটি হয়ে পড়ে আছে বাড়িতে
ধারদেনা জামার পাশে জামা হয়ে ঝুলছে
এখন তিনি অন্ধকারে হাঁটছেন অন্ধকার হয়ে।
তিনি ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মতো গ্রামীণ সন্ধ্যায়—
মাঠের ভিতর মাঠ হয়ে আছেন তিনি,
হেমন্তের ভিতর হেমন্ত হয়ে হাঁটছেন তিনি

ঐ তো তাঁর গা দিয়ে মাঠের আভা। কুয়াশার আভা—
ঐ তো জীবনানন্দ দাশ পলতাবাজারের বাইরে দিয়ে
চলে যাচ্ছেন—।
চলে যাচ্ছেন অন্ধকারের আত্মা টপকে, বই খাতার কঙ্কাল টপকে
পৃথিবীর শতাব্দী-শতাব্দীব্যাপী জলের ভিতর

সিনেমাঘর

পৌলোমী সেনগুপ্ত

গোপন দরজা খুলে
অন্ধকারে পা—
সামনে কলম্বাস

নীরক্ত উজান মাঠ ও
মরুভূমির দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন,
যেন বড্ড কঠিন হয়ে গিয়েছে
পরীক্ষার প্রশ্ন

কাউবয়রা ল্যাসো ছুঁড়ে বন্দি করছিল কাঁটাগাছ
মহা আড়ম্বরে সূর্য উঠছিল পশ্চিম আলো করে

তিনি দু-হাত প্রসারিত করে
মরুভূমিকে জড়িয়ে ধরলেন,
আলিঙ্গন করলেন নিষ্পাপ ঘাসভূমিকে,
তাঁর যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সব উত্তর
বেমালুম মিলে যাচ্ছিল

ম্যানহাটনের চওড়া বড়রাস্তার মতো
প্রসারিত হচ্ছিল তাঁর হৃদয়,
যেন সোনার খনি
তেলের আড়ত
উল্লসিত গমখেত
থেকে তিনি শুনছেন মিসাইলের হইহল্লা

আটলান্টার তুলোর বাগানের মধ্যে দিয়ে
তীব্র হাওয়ার সঙ্গে উড়ে গেল
স্কারলেট
তার পরই লিয়েন্ডারের
বিমূঢ় রোজ, আবার
দেখা হবে

হবেই
সামনের শতকে

তিনি হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন
গরিমাময় সেই হাওয়াকে
পিস্তলের শব্দে কান পাতা যাচ্ছিল না স্টেডিয়ামে
আমরা সাংবাদিকরা চেপে ধরছিলাম
পরস্পরের হাত
দুলে উঠছিল সান্তামেরির মাস্তুল
স্ট্যাচু অব লিবার্টির মাথায় তিনি হাত বুলিয়ে দিলেন
এলোমেলো করে দিলেন নির্মেঘ আকাশের চুল

গোপন দরজা দিয়ে বেরোবার মুখে
তিনি ফিরে তাকালেন
নিভৃত চোখের কোণে অদৃশ্য বলিরেখায়
হঠাৎই ঘুম ভেঙে জেগে উঠল
হলিউড…

কলম্বাস
কলম্বিয়া
পিকচার্স
লাইটম্যান কোথায়—এদিকে—কোথায়
লাইটম্যান!

গত শীতে লেখা একটি সোয়েটার

জয়ন্ত ভৌমিক

পাহাড় থেকে পাহাড়ে তুমি দখল ক'রে নিচ্ছো শীতকাল,—
তোমার দুহাত জুড়ে এখন শুধু পশম,
পশম রাজ্য,
পশম তার রাজ্যবিস্তার করছে তোমার দুহাতে এখন :
সমস্ত পাহাড় থেকে তুমি হাতের মুঠোয় টেনে নিচ্ছো শীতকাল,
যাবতীয় পশম থেকে দুহাতে লাগিয়ে নিচ্ছো ওম্
আর সমস্ত শীতকালকে উপহার দিতে গিয়ে
দুহাতে মিশিয়ে দিচ্ছো উল-বোনা,
উল-বোনার কাঁটা,
শীতকে কী সাহায্য করছো তুমি ? যাতে সে
বহুক্ষণ, বহুদিন, আরও বহুমাস ধ'রে সে আমাদের
আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে পারে ?

...কিন্তু তুমি কি জানো না, শীতের দুপায়ে,
ভারী পাথরের মতো বাঁধা বসন্তকাল,—সে টানতে পারছে না,
কিছুতেই শীতে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না কোনোভাবেই দুটো মাস,
তিনটে মাস, অজস্র শিলাবৃষ্টির সঙ্গে
শত শত হিমাঙ্ক নিয়েও ? এবং টানতে পারছে না তাই
পেছনে ফেলে যাচ্ছে, পেছনে তার পড়ে থাকছে বসন্তকাল ?
তুমি কি জানো না এইসব ?—
...কিন্তু দ্যাখো, পায়ে-বাঁধা বসন্তকে ফেলে রেখে, ওই দ্যাখো,
শীত কীরকম ভীতুর মতো পালিয়ে যাচ্ছে ল্যাজ গুটিয়ে,—
কিন্তু তুমিও কি, সেই একইরকম চলে যাচ্ছো, সরে যাচ্ছো এখন ?
কিন্তু কোথায় রেখে যাবে,—এই বসন্তের দেশে এখন
কার কাছে ফেলে যাবে, তোমার উল-বোনার কাঁটা,
উল বুনতে-বুনতে কাঁটা হয়ে-যাওয়া তোমার
ওই দুটো হাত, কার কাছে ?...

বাইসন

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নক্ষত্র-সমুদ্র থেকে দূরে যাযাবর পাখিদের অবিবাহিত পক্ষীশালা
একটিতে ভগ্নচক্ষু পুরুষ
অপরটিতে ভগ্নকর্ণ নারী পাখিদের ভিড়
পাখিরা যাযাবর হলেও অবিবাহিত, পক্ষীশালায় বসবাস
সঙ্গম নেই, উড্ডীনতা নেই, শস্যপ্রবাহ নেই...
যাযাবর পাখিগুলি একদিন সমকামী হল
তাদের থ্যাঁতলানো পায়ুমুখ থেকে মুছে গেল সাইবেরিয়ার স্বপ্ন
ও তাইওয়ান শস্যক্ষেত্রের বিবর্ণ ল্যান্ডস্কেপ্
এভাবেই দিনকাটে রাতকাটে...
অসতর্ক সমুদ্র দেখা যায়।

একদিন মধ্যাহ্নে
নক্ষত্র-সমুদ্রের পাশে এসে দাঁড়ায়
একটি কৃষ্ণকায় বাইসন
তার চোখের সামনে প্রসূতি সমুদ্রের ফুলে ওঠা সামুদ্রিক পেট
মাথা নিচু ক'রে বাইসনটি তার হিরন্ময় শিং দিয়ে
সমুদ্রকে ঠেলতে শুরু করে
এবং পায়ের তলায় ক্রমশ জন্ম নিতে থাকে
একটি সুবর্ণময় বালিয়াড়ি

অবিবাহিত পক্ষীশালার পাখিরা এই দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হ'য়ে গেল
তারা লক্ষ্য করলো
বাইসনের শিং থেকে গড়িয়ে পড়া স্বেদ
এবং কাঁধের পেশীর ক্রমবর্ধমান ওঠাপড়া,
তারা লক্ষ্য করলো
সমুদ্রের নিরন্তর প্রসববেদনা
এবং সদ্যোজাত বালিয়াড়ির রোমহর্ষক জন্মবৃত্তান্ত
তাদের নিঃশব্দ চিৎকারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল ঝাউবীথি
ও মধ্যাহ্নের হ্যাংওভার

এল রাত্রি।
অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় সংকুচিত যাযাবর পাখিরা
পক্ষীশালার হিমগর্ভ দেওয়ালগাত্রে জ্বলন্ত বর্শার মতো নিক্ষেপ করতে লাগলো
তাদের প্রতিটি আগ্নেয় পালক।
পর্ণমোচী রাজপথে বাইসনের শিং দেখলে
নিভৃতে তোমার কথা মনে পড়ে বাইসনের শিং থেকে উঠে আসা ধূসর ধুনোর গন্ধ
সেই গন্ধ থেকে সৃষ্টি হওয়া স্ফটিক স্বচ্ছ মালা
এবং মালার পরিধানকারিণীর গলা জুড়ে
সারসার ঋক্ষ জলের দাগ
সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়।

বাইসনের শিং থেকে একদিন নেমে আসে
দুখানি প্রসারিত হাত
এপাশেরটি সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে
ওপাশ বাতাসের গায়ে চেপে ধরে
অদৃশ্য খাগের কলম
যেখানে খাগ-অর্থে কখনোই আগ্নেয় বর্শাফলক নয়
ইথার-তরঙ্গে ভেসে ওঠা
পানিপথের রহস্যময় রেডিও-নাটক অথবা
জন্মলগ্ন থেকে চলচ্ছক্তিহীন কোন উপকূলবর্তী বালিয়াড়ির
একান্ত গোপনীয় লিবিডোপ্রবাহ

শ্রাবণবেলায় যা মানিপ্ল্যান্টের পাতার মতো স্থির

জলের দাগ
ডাঙার দাগ
চারিপাশ উদ্ভাসিত ক'রে
প্রতিটি বাইসন যেন শিং উঁচিয়ে ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে…
তার দু'পাশের দুটি হাত
অসহায় ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরতে চাইছে
আমাদের গলা, আমাদের কোমর, আমাদের নিস্তব্ধতা এবং সমগ্র আমাদের…
যেখানে আমরা মানে পানিপথ
অথবা রাত্রিজলব্যাপী বেঁচে থাকার এক অনিশ্চিত ধারাবিবরণী।

ব্লাইন্ডস্কুলের কাছে

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

ডায়মন্ডহারবার রোডের আশেপাশে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ আছে। কোনখানটায় বলছি। ব্লাইন্ডস্কুল চেনেন? সেখান থেকে ডান হাত বরাবর গুণে গুণে ১৭২ পা হাঁটলে একটা জায়গায় পৌঁছবেন, আকাশ যেখানে জাফরান রঙের, দুদিকের দেবদারু থেকে অবিরত হলুদ পাতা খসে পড়ছে…। এইবার, নৈঋত কোণে মুখ করে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজলে আপনি রেস্তোরাঁটি দেখতে পাবেন। জাপানি হাইকুর চেয়েও ছোট্ট, মাত্র দুজন মুখোমুখি বসতে পারে, টেবিলে সবসময় জ্বলে লাল মোমবাতি, কথা বলতে হয় ঝাউবনের ফিসফিসে ভাষায়। একটা অদ্ভুত স্যুপ পাওয়া যায়, নাম 'ভাসমান স্বপ্নের স্রোতে'। তাতে কি কি থাকে বলছিঃ শুশুকের দুধ, কীটসের তিনফোঁটা চোখের জল, সবুজ লেটুস, ঝিঁঝিঁপোকার ডাক, দু চামচ কাজুফেনি আর তাহিতি সুন্দরীদের দীর্ঘশ্বাস। ডিনার শেষ হলে, মৌরির প্লেটে ফরচুন কুকি সাজিয়ে দেওয়া হয়। ফরচুন কুকি কাকে বলে জানেন? করবীফুলের বড় বড় বিচি, তার মধ্যে ভাঁজ করা কাগজে মজার মজার কথা লেখা থাকে। প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, আমারটায় লেখা ছিলঃ আপনার ২৪ নম্বর জন্মদিনে একটা জলফড়িং-এর সঙ্গে ধাক্কা লেগে আপনি মারা যাবেন।

আগামীকাল সন্ধে ঠিক সাতটায়, মাদমোয়াজেল, আমি আপনার জন্য ওখানে অপেক্ষা করবো।

মিনিবাস

সব্যসাচী সরকার

বেহালাগামী মিনিবাসে উঠে পড়লে তোমাকে আরো নিষ্ঠুর মনে হয়

তখনই মাটিতে হাঁটু অবধি গেঁথে যায় আমার পা
এক পা এগোতে পারি না আর
সারা গায়ে ফুটে ওঠে চাবুকের দাগ
নিরুপায় হয়ে মাথা নিচু করলেই আমি দেখতে পাই
মাটির অনেক তলা দিয়ে হর্ন দিতে দিতে চলে যাচ্ছে একটা মিনিবাস

তোমার পিঠে হাত দিয়ে তুলে নিচ্ছে কন্ডাক্টর,
একটু পরেই ধুলোর ঝড় উঠল,
জানালা বন্ধ করতে পারছ না
শুধু ধুলো, ধুলো আর ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছ তুমি,
ভয়ে স্টিয়ারিং ছেড়ে ড্রাইভার চিৎকার করে উঠল,
বালিতে বসে যাচ্ছে চাকা আর হঠাৎই হেসে উঠছে
চাকার তলায় আটকে পড়া পিঁপড়েরা
কীভাবে যেন তারা দল বেঁধে উঠে পড়ছে বাসে
দখল করে নিচ্ছে একটার পর একটা ভাল ভাল সিট

তারপর পেট্রোলের নদী
তাতে ইতস্তত ভাসতে থাকা একটা দুটো উভচর প্রাণী
পড়ে থাকা মানিব্যাগ
স্কার্টের বোতাম

সারাটা জুন মাস সে হেঁটে যায় ঘুমের মধ্যে

রোশেনারা মিশ্র

'সমস্তদিন আমার মনে পড়ল আপনাকে'

'ও আমার মধু আর রেজিনে গড়া ছেলে আমার স্বপ্নের চারপাশে গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছিল আপনার ফেলে যাওয়া স্বর, যেন রোদে সেঁকে তোলা ঢাউস ঘুড়ি, যেন অজানিত বৃষ্টিতে ভিজে ফেঁপে ওঠা এক মস্ত লেপ শুয়ে আছে ছাতা ধরা কার্নিসে, যার পাশ দিয়ে খিল খিল শব্দে হেঁটে যেতে পারে শিশুরা, এক কদাকার পাখি পারে পরম নিশ্চিন্তে ডানা গুটিয়ে বসতে, আর পারে গুটিগুটি আগুনের স্বর্ণাভ গোলক নেহাতই খুদে গুবরে পোকার উজ্জ্বল রঙছটা নিয়ে'

'শীত করে। শুকনো আর রাগীরাগী শীত নয়, তার পশমি চাদরে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির ঠাসবুনোট কুয়াশার গন্ধ। জোলো বাতাস আর মহাদেশীয় মাটির গন্ধ' 'সবমিলিয়ে ঘুম পেতে থাকে খুব। ইচ্ছে করে কথা বলতে বলতে রিসিভারে ডুবিয়ে দিই মুখ, যেন একটা এইটুকুন তুলতুলে ফেনাদার বালিশ, আর নরম সাদা টেপফ্রক ঝোড়ো বাতাসে ফুলে ওঠা পালের মতো, জারিনার লেস ঝরে পড়া গাউনের মতো ঘিরে ফেলুক তাকে, আর আপনি কথা বলে যান, ও আমার মহিমান্বিত দরগার শান্ত মোমবাতি, বলেই যান, কোমল শোকসঙ্গীতের মতো, ট্রপিকাল বৃষ্টির মতো নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, যাতে খড়ের ওপর গজিয়ে উঠতে পারে রোঁয়া তোলা কচি ধানের চারা, দু-একটা স্পর্শকাতুর গরবী ব্যাঙের ছাতা। ঘুমের মধ্যে আমি আপনাকে দেখি, ঘুমের বাইরে আমি আপনাকে শুনি, একদিন অমিতব্যয়ী দিবাস্বপ্নে রাজ্ঞীর মত। তাসখন্দি উপকথার নাচে উজ্জ্বল মুকুটেরা যেমন অর্ধশরীর ডুবিয়ে মালকিনের লালচুলে চুমু খায়, কৃতজ্ঞতায়, লাল নীল বেগনে লোকায়ত নকসা বুনে দেওয়া ঘাসফুল-তিতিডাক-বিস্তীর্ণ নীল আকাশের মতো দীর্ঘতম চুম্বন, যে চুমু খেয়েছিল আসল, কাপ্তেন গ্রে-কে'

'সমস্ত দিন আমি এ-ত কষ্টে রঙিন, আথান্তরে'

'আপনার ফিরে যাওয়া হিরের দীর্ঘ চুলে ঘেরা পাহাড়ের কানাত তোলা শহরে—'

'মধ্যরাতের ঝমঝমে আপনার বারম্বার ভেঙে যাওয়া ঘুম—'

‘যেন বিশেষ কিছু নয়, কামরার আলোটুকুই সব, কিছু নয় নিজেদের
জেল্লাদার মুখোশে গেঁয়ো সাড় ফিরে পাওয়া’ ‘ও আমার অভিশাপ,
পুষ্পস্তবকের শুভেচ্ছা ঘেরা ছেলে, এত কেন সহজ নিদ্রা পাবে তুমি,
কেননা তোমারও মুখে শরীর পেতে শোবে রামধনু, ওগো নিষ্ঠুর, এত
অকাতরে কেনই বা ভুলে যাবে সর্বান্তকরণে ক-ত ধন্যবাদ দিয়েছি, আর
আমার স্বপ্নের চারপাশে কিভাবে ঝরে পড়েছে শ্যামাপোকা, পিঁপড়ের
ডানা, কিভাবে গলে গলে শেষ হয়ে যাওয়া মোমবাতি আমাকে ঘুমের মধ্যে
অন্ধকারে ফেলে গেছে একা, কীভাবে জল পেয়ে পচে উঠেছে আমার
খিটমিটে—সদাসতর্ক—সর্বশেষ ডিঙিনৌকাটি কীভাবে কাঠবাদামের মতো
দুপাশে ডানা লাগিয়ে উড়ে গেছে আমার এতদিনের শান্ত চোখেরা, কিভাবে
জিদ্দি স্বরে ‘কীই-ই’ বলবে বলে শবের পাহাড়ে ডুবে যাচ্ছে আমার ভূতে
পাওয়া স্বর, আর তার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে’
‘‘উনত্রিশ ভোজবাজী আর এক সরল অভিমান খুলে গেলো আরবি গালিচা
মেলে দেওয়া আপনার স্বরে ‘শোনো মেয়ে’ শুনে সাড়া দিতে’’

অক্ষর

অর্ণব সাহা

বিদায় বর্ণালী, তুমি সূর্যাস্তে এসেছ, আজ গোধূলিরাঙানো ঐ
বিষণ্ণ চোখের দিকে আর তাকাব না,
আর আমি লিখব না চিঠি, হয়তো কোনও ভরদুপুরে
ডাকপিয়ন থমকে যাবে সদর দরজায়, নিঃসঙ্গ চিঠির বাক্সে
জন্ম নেবে লতাগাছ, স্কুল থেকে ফেরার পথ শূন্যতায়
ভরে উঠবে, বাঁকানো ফলকে হাত ছোঁয়াতেই
মনে পড়বে ঃ একদিন চিঠিই ছিল তোমার নিজস্ব বন্ধু,
পাথুরে শহর থেকে
ডানামেলা আকরেরা পড়ার টেবিলে এসে আত্মসমর্পণ
করতো, তুমি তা’ কুড়িয়ে নিতে, নিঃস্ব ছেলেটিও তার
শব্দের আভাসে ঠিক চিনে নিত অন্ধকার, তোমার নীলিমা,
তুমি জানো সেই আলোর উৎস ? কি শিখেছ অন্ধকার ? সে তবে
মায়াবী স্রোতে জেবলে দেওয়া ডাকবাক্স ? সে তবে
অক্ষরের বরমাল্যে মিশে গিয়ে শব্দকেই অস্বীকার করা ?
বর্ণালী, জেনেছো, সেই ছেলেটি কীভাবে তার পলাশের
লতাগুল্মে লিখেছে আগুন ? এরপর কীভাবে সে-ও
বৃষ্টিকে বরণ করে, তারও জীর্ণ প্রশাখায় ভরে ওঠে অসম্ভব
মুকুল রাঙানো—আজ
তুমি তো উচ্ছল নৌকো, দিগ্বলয়ে পাড়ি দিচ্ছ, তোমার
বিষণ্ণ দৃষ্টি থমকে গেছে মোহনায়, যে সৈকতে মিশে যায়
প্রতিটি সচল মৃত্যু, নিষ্ফল জোনাকি বহু দূর থেকে
ভয় দেখায়···তবু সে ছেলেটি এই
উপাখ্যান লিখে রাখবে, তোমাকে উৎসর্গ করবে ওর মিথ্যে
দিনযাপন, তাকাও বর্ণালী, দেখ, ওর খোলা
চিঠির পৃষ্ঠা ঘিরে ফেলছে মফস্বল, নিঃশব্দ
চিঠির ভাষা কাঁটাতার টপকে গেছে, ডানামেলা
অক্ষরেরা আত্মসমর্পণ করছে
দুঃখী, রোগা মেয়েদের পড়ার টেবিলে···

মন্তাজ

সব্যসাচী ভৌমিক

যে নির্দেশ দিচ্ছে স্থিরদৃশ্যের, ধাওয়া করো তাকেই
চলচ্ছবিতে দুনিয়া গড়াবে, ছুট লাগাও স্থিরদৃশ্য থেকে।

পারো যদি দৃশ্যের পিঠে দৃশ্য চড়িয়ে মন্তাজ গড়ো, চাও তো
জেগে উঠতে পারো সেখান থেকে যেখানে ঘুমের ভিতর বেসামাল,
স্থিরদৃশ্য বড়োজোর ধরে রাখতে পারে এই টেবিল, জেগে ওঠা
সহাস্য সকাল

চলচ্ছবিতেই ধরা পড়ে সেখানে বই বিছিয়ে বসল ভাইবোন,
সকালজুড়ে গুমরে উঠছেন সুখলতা রাও, 'পাখি সব করে রব...'

উড়ান ভোলোই যদি, বসে থাকারও গতি থাকে,
স্থিরদৃশ্যে পেপারওয়েট তাই উড়ে গেল চলচ্ছবিতে, জায়গা করল
ছোট্ট দেরাজে, যেখানে বাতিল কাগজেরা পড়ে আছে স্থিরদৃশ্যে,
তারই একপাশে,

বাইরে ট্রামরাস্তা এঁকে বেঁকে বিঁধছে বুকের ভিতর, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটে
স্থিরদৃশ্যে লিখে রাখে সেই মূল্যমান, চলচ্ছবিতে ছোঁয়া যায়
অফিসপাড়া, এমনকি নদীতীর,
মাঝপথে চটজলদি পড়ে ফেলা যায় স্থির পোস্টারে ঢাকা
শহরের দেওয়াল।

হাওয়া দিচ্ছে ঢিমেতালে, বলিহারি স্থিরদৃশ্য, কেঁপে উঠছে সেই হাওয়ায়
আর আটকানো হোর্ডিং থেকে খুলে বেরিয়ে আসছে চলচ্ছবি হয়ে,
ঢিমেতালে হলেও গড়াচ্ছে পৃথিবী, ভরে আছে দৃশ্যের পিঠে
দৃশ্য চড়িয়ে গড়া মন্তাজে,
সহাস্য সকাল জুড়ে গুমরে উঠছেন সুখলতা রাও,
স্থির পোস্টার ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে শহরের দেওয়াল।

মেঘ ও অন্তরায়

সুমন গুণ

১.
কিছুটা সুন্দর জলে হাঁসেদের পাঠ, হাঁসেদেরও
সালোয়ার ভেজে, আঙুল আশ্লেষে টেনে নেয়
বিম্বদলজলে : এই তথ্য সারস্বত, শুধু যদি
জানা যেত হাঁসেদের অন্য কোনও নির্বিচার নাম

তাহলে, কুশলী বৃক্ষে আরও কিছু রোমাঞ্চ পেতাম

২.
দুদিকে দুমুঠো ভয় ; আজও কোনও রোমাঞ্চ হল না

দুজনই গন্তব্য ভেবে বজ্রপাত, মস্করা ও ফুল
নিয়ে বের হল, অল্প ভিড়, তারই মাপে
সমস্ত বেদনা নিয়ে লোপ পেল পুরনো শহর

৩.
কলকাতায় বৃষ্টি, ঘরে স্বয়ংক্রিয় আত্মীয়স্বজন
আলোর গমক, জল, সুপুরিগাছের
ভিজে ডাল, হাওয়া, পাতা ও জানালা

বাইরে খুব বৃষ্টি, ঘরে সোমবার, আত্মীয়স্বজন

বিসর্জন

দেবজ্যোতি রায়

সারি সারি নৌকা ভাসে মাঝির অস্তিত্ব জুড়ে বর্ণহীন জল
ঠিকানা উধাও তার। পিনকোড ভেসে যাচ্ছে উদাসীন স্রোতে।
সে কি কোনো স্বপ্ন দেখে—শেষ রজনীর চাঁদ ছুঁয়ে যাবে সামান্য গলুই
জীবনও সামান্য তার। অসফল বুদ্বুদ্ ছাড়া
উল্লেখ করার মতো ঘন বনানীর ছায়া জোটেনি কপালে
নির্জন তারার আভা, বহুদূরে জ্বলে আর নেভে

দিন ঘোরে চক্রাকারে। অস্পষ্ট নিয়তি তাকে যতদূর টেনে নেয়
তারপরও পাঠোদ্ধারহীন সব দুর্বোধ্য হরফ।
চাঁদ ডোবে নিজস্ব ভঙ্গিতে এবং সম্মতি ডোবে
নীরবতা বৈঠার গায়ে
অজানা প্রতীক এসে ঢেকে দেয় প্রতিমার রঙ
এখন সম্পর্ক মানে জন্মান্ধের দৃষ্টি সম্ভাবনা।

পিকনিক

যশোধরা রায়চৌধুরী

উড়াতে এসেছি মজা, মাঠভর্তি। তোরা যে চাদর
পার্তবি বলে এনেছিলি, তাতে সব বড় বড় ছোপ
সে কি রে, রক্তের নাকি ঃ রুণি তোর হানাবাড়ি থেকে
আর কি কি এনেছিস ঃ শৌখিন চামচ, কাঁটা, ছুরি···

দে তো কাঁটা দুটো আমি লোফালুফি দেখাবো, ব্যালেন্স
বাঁদিকে আপনারা বউদি ডানদিকে তোরা খুকুমণি
আমি ঠিক মধ্যখানে সোডার বোতল
কিছুক্ষণ ভুসভুসিয়ে তার পর চুপ মেরে যাব, নেশা হলে···

মাঠময় উড়ে যাচ্ছে হাসি ও ফড়িং
মাঠময় উড়ে যাচ্ছে ইয়ার্কি, মজাক
উনুন, যা কোনোদিন ধরে উঠতে পারে না পুরোটা
তাকে আমরা জেলে দেবো হৃদয়ের মুহব্বত, মায়া দিয়ে দিয়ে

সেবারের পিকনিকে মায়াদিও ছিল না রে? ডিসেম্বর মাসে
কাপড়ে আগুন লেগেছিল, ওও শেষসময়ে ভুল বুঝতে পেরে
নেভানোর ইচ্ছে নিয়ে বিছানায় এসে গড়াচ্ছিল
বেডকভারে···বেডকভারে···এটা তবে সেই বেডকভার?

আমরা সকলে মিলে মজা মারছি যেটার ওপরে···

ম্যাজিক

প্রসূন ভৌমিক

সেই ফিরে আসা সেই তোমার কাছেই প্রতিবার দীঘিজল
সেই আবার ঘুরে ফিরে সমস্ত অঞ্জলি নিয়ে আঁখি ছলোচ্ছল
মাটির প্রতিমা মোর, প্রাণহীনা, ঘুরে ফিরে তোমার কাছেই···

ভেবো না ভেবো না ফের আবেদনপত্র নিয়ে কাকুতিমিনতি
ফের কোনো অসম্ভব প্রস্তাব এনে তোমার ইচ্ছার প্রতি
তিলমাত্র অবিচার করব, শুধু ফিরে আসা, ফিরে আসা এই

পুজো আমার সাঙ্গ হল, দ্যাখো বন্ধু বন্ধুমোর ম্যাজিক দেখাই
ফুঁ দাও ফুঁ দাও, মুঠো, দ্যাখো বিন্দু, প্রাণবন্ধু প্রেমিক হয়ে যায়
তোমার ফুঁয়েই হয়। তাকে না-হয় বন্ধুই ডেকো আজীবন

দোহাই ভেবোনা এও প্রতিপক্ষ···যোজন যোজন দূরে থাকে···
আমি বহুদূরে বসে নিকটের চেয়ে বেশী পেয়েছি তোমাকে

কলমে ছুঁয়েছি তোকে, তোকে আমি প্রতিবার কলমে চুম্বন

বুদ্ধ

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শালিখই উৎসব আজ—এই মর্মে প্রচারিত সাবধানবাণী
তোমার হৃদয় থেকে নিয়ে যায় ঐহিকতা—
দীর্ঘতম বেদনাও, সংস্কারবশে।
রহস্য শাক্যের মূল, অবিমিশ্র হেমন্তেও পরিবর্তনীয় ;
তোমার একটি চোখে আঁধার পাখির মতো
ও নিশানে স্বাবলম্বী চেতনাকে ধর্ম ঘোষণায়
দেখিয়েছে বাংলার নিরুৎসারে স্তব্ধ জুনিপার,
গাভীদের বিষণ্ণতা আশ্চর্য ভোরে—
সময়ের পূর্বান্তে এদেশ তোমার।

প্রতিটি যুদ্ধের কাছে নতমুখে বোসো ;
এখন সন্ধ্যায় কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে নদীগুলি,
জলস্পর্শী ছোরা।

এখন আবিষ্কার তোমাকেও দিতে পারি, জন্মভূমির মতো দ্রুত—
আমাদের মৃতদেহ নেই ;
অতিদূর স্বজনকে নীলিমা, শস্যের মতো পুরাতন দেখে
গভীর বছর থেকে উঠে আসে শান্তি আর মৃত ব্যক্তিদের গোপনতা।
ভিক্ষুকপ্রধান তারা, নীরবে জানিয়েছিল ঃ এইপথ অন্নসংস্থানের।

প্রিয় কবি—কোনও এক দূরতম গ্রহের মানুষ

রণজিৎ দাশগুপ্ত

এই রৌদ্রে, দীর্ঘতম ছায়া ফেলে হেঁটে চলেছেন তিনি
আশ্চর্য চপ্পল পায়ে, ফানুস উড়িয়ে।
আমরা, শহরে যারা রাস্তায় রাস্তায় ডানা ঝাপটাই সারাদিন
বাজারের জঞ্জাল মেখে উঠে আসি, নখে ময়লা,
বন্ধুদের ক্ষত থেকে গড়ানো রক্ত চেটে নিই—অদ্ভুত পাখি আমরা,
দু'চার মাসের জন্য তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব, ভাবি। আহা,
দেহাতি ধুলোয় খুব গড়াগড়ি খাব আর
নরম পাথরে বাজনা বাজাব দু'হাতে। আর
সামুদ্রিক ঘোড়াদের নাচ হবে সন্ধ্যায় নদীর কিনারে
পা ডুবিয়ে ছোট্ট মিনারশীর্ষে ফুটে ওঠা একবিন্দু আলো দেখে
সময় কাটাব। তিনি—তিনি ছাড়া কে আর
কে আর বলো, তাঁর সবুজ তর্জনী তুলে আমাদের
এইসব গাছ চেনাবেন? চেনাবেন লতাদের জটিল বুনন? বোঝাবেন
অতীত, অদৃশ্য সব রাজাদের নাম কীভাবে খোদাই হয়
মেঘের প্রাসাদে? এই দু'চার মাসের জন্য
তাঁর সঙ্গ চ'লে যাবো, ভাবি—ওই রৌদ্রে, তাঁর দীর্ঘতম
সম্ভব ছায়া ফেলে, নেমে এসেছেন তিনি
আশ্চর্য চপ্পল পায়ে, আশ্চর্য ফানুস উড়িয়ে।

কল্পান্ত

আবীর সিংহ

ফুটবলে কিক মারলো যে ছেলেটি
সে জানতেও পারলো না
এই কিক হয়তো প্রকৃতপক্ষে কয়েকশো কোটি
বছর আগেই তার মারা হয়ে গেছে···

কমরেডদের জানি একথা বিশ্বাস হবে না
আসলে 'কল্পান্ত' বলে একটি শব্দ
বেদান্তে বরাবর ছিলোই—
ইদানীং মাননীয় হকিংও যাকে ক্রমপ্রসারণ ও সংকোচন
অথবা এককথায় 'বিগ ব্যাং' নামে ডাকছেন।

অশিক্ষিত কমরেডদের বোঝা উচিত, কম্পিউটার
প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্বোধ; তা'তে ডাটা ভরা থাকে!

আঠারো বছর বয়স

সুব্রত সিন্‌হা

সহস্র খান্ডব-দহনের স্মৃতি বুকে জড়িয়ে, এই আমি যুবক হলাম
আগুনের হাত, আগুনের ঠোঁট, নিজের রক্তে ডোবানো দীর্ঘশ্বাস নিয়ে
আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি নিঃসঙ্গ, একাকী—

অচুম্বিত ঠোঁটের অতি কাছে ঝুলন্ত ডালিমের নিম-অভিপ্রায় নিয়ে
কালের মহাজ্ঞানী ধূসর শকুন উড়ে যায় হিমঘ্ন ঋতুতে
আমি দাঁড়িয়ে থাকি জটিল অসুখের কাছে—

পৃথিবীর যাবতীয় আদি রিপু নিয়ে, এই আমি আলোর ফসিল হলাম

সন্ত্রাস বৈশাখে

বিপ্রতীপ দে

আমি মূর্খের দলে পরী
দুটি শাদা ধবধবে ডানা
মাথা ফাটা চৌচির ঘড়ি
খাতা দুদিকেই রুল টানা

বাধা বাধ্যতা ভুলে যেতে
ভাঙা অক্ষর বিদ্রোহী
কিছু সন্ধানে মরে যেতে
নই খুব লাবণ্যময়ী

নিচু নর্দমা মরা পাখি
লাল পিঁপড়ের উৎসাহে
যদি একবার বেঁচে উঠে
জন গণসঙ্গীত গাহে ?

ছোটো গর্তের মাঝখানে
কূপ মণ্ডূক বন্দনা
ছেঁড়ো উন্মাদ গানে গানে
আলো সূর্য না চন্দ্র না

ভয় কাকে তুমি চমকাবে
নব সন্ত্রাস বৈশাখে
দ্যাখো ফুলেফুলে চুমু খেয়ে
ঠোঁট প্যাপড়ির কাছে ঋণী

রেজারেক্‌শন্‌

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

নজর করে দ্যাখো এখানে কিছুদিন আপাতউন্মাদ সাগর মাফিয়ারা
ছিলো কি ডেরা বেঁধে, সাগর উত্তাল প্রবাল দ্বীপ একা চিহ্ন ধরে আছে ?

কাঁকড়া কলোনীর কেন্দ্রবিন্দুতে গ্রেনেডশেল আর বাক্স চুরুটের
এবং কাছে দূরে বিগত বিলাসের বিয়ার ক্যান ভাঙা তুচ্ছ রেডিও।

সীগাল ঝাঁক এসে তীক্ষ্ণচঞ্চুতে আরামে খুঁটে খায় ব্রাউন সালামি,
জলের ঝাপটায় এখনও দোল খায় রৌদ্র আদরে লাইফবোট ছেঁড়া।

ওরা কি নিয়ে গ্যাছে যাত্রাম্যাপ আর মগজে ভরে নিয়ে বিগত স্মৃতিশোক ?
ক্লান্ত আরামে রয়েছে একজন বালির চর ঘেঁষে শায়িত চিরঘুমে।

কখন রাত্রির প্রবল আশ্লেষে সাগরকন্যারা ডাঙায় উঠে আসে,
আবেগে চেপে ধরে গ্রেনেড স্তনদ্বয় বিগত মাফিয়ার শিথিল ওষ্ঠেই

লেজের ঝাপটায় কখনও তুলে আনে লবণ জলে মেশা প্রাণের স্মৃতিদের
লোকটি জেগে ওঠে, সাগর বুক চিরে উন্মোচিত হয় প্রবাল কঙ্কাল।

তিনটি সখি তার বাসর সজ্জায় চুপটি জেগে থাকে আভোর রাত্রি ;
সময় কেটে যায় যৌন কোলাহলে এবং যখনই প্রদোষ স্পর্শে

বিগত মাফিয়া সাগরে ঝাঁপ দেয়, দুখানি পায়ে তার লেজের তোলপাড়,
সাঁতরে নেমে যায় জলের গভীরে, প্রবল পিঞ্জরে সাজানো আশ্রয়,

যেখানে মারমেড সারাটি দিনমান সাজিয়ে বসে থাকে অঢেল স্বপ্ন,
দেহটি ডুবে যায় জোয়ার-ঝঞ্ঝায়, হাঙর শুশুকের কেবলই ক্ষিধে বাড়ে।

‘অন্তরীপ’ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত

শিবশম্ভু পাল-এর

নির্বাচিত বিস্ময়পঙ্ক্তি ৩০

পঞ্চাশের প্রচার-উদাসী যে কবি কবিতার সঙ্গে আজও অবিরাম আত্মীয়তা লালন করে যাচ্ছেন নিজস্ব প্রকাশবিন্যাসের অবিকল্প দক্ষতায়

এ ছাড়া সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা-সম্পর্কিত অবশ্যপাঠ্য চারটি প্রবন্ধগ্রন্থ

এক সময় দুই কবি ২০

প্রতীক্ষিত বর্ণমালা ২০

বিষয় থেকে বিন্যাসে ২৫

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি ১২

অন্তরীপ

সম্পাদক সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৫ খেলাতবাবু লেন টালাপার্ক কলকাতা ৩৭
মুদ্রক সোম প্রিন্টার্স ৭ কানাইলাল চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা ৭৬

প্রাপ্তিস্থান পাতিরাম

কুড়ি টাকা